বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংখ্যা

১৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ১৪তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'১৯ - মার্চ ২০২০

প্রধান সম্পাদক
শওকত হোসেন

সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

কম্পোজ
প্রান্তিক

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

সম্পাদকীয় : এক

যে আধুনিক জীবন আমরা পেয়েছি, সেই জীবনকে অতি ভোগ্য করবার জন্যে মরিয়া হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে চলছি। এতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্জ্যের পরিমাণ। যার মধ্যে অপচনশীল ও বিপজ্জনক বর্জ্যও রয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের বর্জ্যকে প্রক্রিয়াজাত করার কোনো ব্যবস্থা নেই, এমনকি পচনশীল বর্জ্যেরও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি।

'বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, অসামঞ্জস্য, শৈথিল্য, সমন্বয়হীনতা প্রকট বাংলাদেশে। যার ফলে বর্জ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরিবেশগত ও মানব-স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি। জৈব, অজৈব মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৩ কোটি টন। মাথাপিছু হিসেবে তা বছরে ১৬০ কেজির কাছাকাছি। ২০২৫ সালের মধ্যে এর পরিমাণ দিনপ্রতি ৪৭ হাজার টন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথাপিছু বছরে তখন হবে ২২০ কেজি। ঢাকা শহরে মোট উৎপাদিত বর্জ্যের কেবলমাত্র শতকরা ৩৭ ভাগ সংগ্রহ করা হয়। বাকি পড়ে থাকে আবাসিক এলাকা, স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে, পথে-ঘাটে, নদী-খালে।' [-আনু মুহাম্মদ]

এ যুগে ই-বর্জ্যে সৃষ্টি করে চলছে মানবজাতির মৃত্যুকূপ। এগুলোর ভেতরে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান– দস্তা, পারদ, সিসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, বেরিলিয়ামসহ আরো অনেক ধাতু। অপচনশীল হওয়ায় এসব বর্জ্য যেমন একদিকে মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলছে অন্যদিকে জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবে মানুষ দিনেদিনে রোগের মহামারিকে আমন্ত্রণ করছে অনায়াসে।

সব মিলিয়ে বর্জ্যকে বর্জ্য না ভেবে যদি আমরা আজও সম্পদ ভাবতে না পারি, তাহলে এর প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারেও আন্তরিক হতে পারবো না। সেখানে রাষ্ট্রের রয়েছে সবচেয়ে বড় ভূমিকা। সুতরাং রাষ্ট্র তথা সরকারকে আমরা যদি বাধ্য করতে পারি, তবেই বর্জ্যকে অভিশাপ না ভেবে আশির্বাদ ভাবতে পারবো। এবং সে অনুসারে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা পারবো বর্জ্য বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে। রাষ্ট্র বা সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে তখনই বাধ্য করা সম্ভব হবে, যখন আমরা সচেতন হয়ে উঠবো। সেই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে 'হালখাতা'র বর্তমান সংখ্যাটি হয়তো কিছুটা কাজে আসতে পারে বলে আশা করা যায়।

সংখ্যাটি প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শরমিন নিশাত
সম্পাদক, হালখাতা
০১.০১.২০২০

সম্পাদকীয় : দুই

বর্জ্য জীবন থেকেই উৎপন্ন, ফলে বর্জ্যের প্রতি অবহেলার অর্থ জীবনের প্রতি অবহেলা। জীবন থেকে সৃষ্ট বলে, বর্জ্যকে অস্বীকার করবার অর্থ নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা! বর্জ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রয়োজনীয় করে তুলবার যে বিজ্ঞান, তাকে গ্রহণ না করার অর্থ, জীবনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়া। সকল সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার নিশিচত করতে চাওয়ার সাধারণ তাৎপর্য হলো, ন্যূনতম সভ্য হতে চাওয়া। আর সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে না চাওয়ার হলো, অসভ্য রয়ে যেতে চাওয়া। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, এবং তার পুনর্ব্যবহার করতে চায় না বা ব্যবহার জানে না, সে ব্যক্তি-গোষ্ঠি নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে দাবি করতে পারে না। হয়তো সে দাবি করতে চায়ও না!

মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে একেবারে কম সময় গড়িয়ে যায়নি। একটি জাতি বা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে হলে, কত সময় পার হওয়ার পর, সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে– সেই বিতর্কে না গিয়ে একটি বিষয়ের দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেটি হলো, জাতি হিসেবে বাঙালি কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবার পথে ন্যূনতম প্রবহমানতা অন্তত রয়েছে কিনা। আর দশটা বিষয়ের মতো পৃথিবীর অনেক দেশ যেখানে বর্জ্য নিয়ে স্বতন্ত্র্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে অনেক আগেই, বাংলাদেশ সেখানে আজও গুরুত্বহীনতার চরমতম একটি জায়গায় ফেলে রেখেছে বিষয়টিকে। এরকম একটি হতাশাজনক পরিস্থিতি থেকেও কাজটি শুরু করতে চাইলে, সেটি কোন্ জায়গা থেকে শুরু হতে পারে, সেটিই বরং আজকের বিবেচ্য হওয়া উচিৎ।

সমস্যা অনুধাবন এবং সে অনুসারে সমাধানের পথে পা ফেলবার আগে সে বিষয়ে বোধ করি কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি দরকার হয়। সেই ধরনের সামান্য বোধ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতেই 'হালখাতা'র এবারের এই উদ্যোগ। এরকম একটি অবরুদ্ধ অপ-ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকে এ-বিষয়ে লেখা পাওয়া কতটা কঠিন, সেটা বলে বোঝাবার যোগ্য বিষয় নয়! তদুপরি সংখ্যাটি বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বোধ-বুদ্ধি সৃষ্টিতে ন্যূনতম কাজে আসলে, সকল কষ্ট লাঘব হয়েছে বলে মনে করা হবে। সংখ্যাটি প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

শওকত হোসেন
প্রধান সম্পাদক, হালখাতা
০১.০১.২০২০

সূচি

প্র ব ন্ধ
বর্জ্য: স্থানিক ও বৈশ্বিক বিপদ
আ নু মু হা ম্ম দ ০৭
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
বি. ডি. র হ ম ত উ ল্লা হ ১৫
বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
মো. আ ফ সা র আ লী ৩৫
বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
এম. ফি রো জ আ হ্ মে দ ৬১
বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
আ ব দু ল আ উ য়া ল ৭৪
বাংলাদেশে বর্জ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
তা ন ভী রু ল হ ক প্র বা ল ৭৭
বর্জ্য নিয়ে কথকতা
ফ রী দু ল আ ল ম ৮০
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
জা ন্না তু ন নি সা ৮৭

প্র ব ন্ধ
বর্জ্য থেকে পরিবেশ বিপর্যয়
ফে র দৌ সী সু ল তা না ১২২
ঢাকার বর্জ্য : একটি অসহনীয় অবস্থা
কা জী মো হা ম্ম দ শী শ ১৩৬

প্র ব ন্ধ
পুনঃপ্রক্রিয়াজাত বর্জ্য ফিরিয়ে দিতে পারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নির্মল পরিবেশ
মো. আ মি নূ র র হ মা ন ১৪২

প্র ব ন্ধ
পলিথিন ও পুঁজিবাদী পাপ
পা ভে ল পা র্থ ১৫১

পলিথিনের সাথে বসবাস নাকি পলিথিনের বিনাশ
কাজী মোহাম্মদ শীশ ১৫৭

প্রবন্ধ
ই-বর্জ্য, দিন দিন জমছে; কোথায় এর ভবিষ্যৎ?
চারু ফেরদৌসী নাঈমা ও মইনামুল হক ১৬২

প্রবন্ধ
হাসপাতাল বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি
ধরিত্রী সরকার সবুজ ১৬৮

প্রবন্ধ

বর্জ্য: স্থানিক ও বৈশ্বিক বিপদ

আনু মুহাম্মদ

ব্যক্তি যেমন সমাজ বা দেশও তেমন, সুস্থ থাকতে গেলে বর্জ্য নিষ্কাশন যথাযথ হতে হবে, তার ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো স্বাস্থ্যকর হতে হবে। কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, অসামঞ্জস্য, শৈথিল্য, সমন্বয়হীনতা প্রকট বাংলাদেশে। যার ফলে বর্জ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরিবেশগত ও মানব-স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি। জৈব, অজৈব মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৩ কোটি টন। মাথাপিছু হিসেবে তা বছরে ১৬০ কেজির কাছাকাছি। ২০২৫ সালের মধ্যে এর পরিমাণ দিনপ্রতি ৪৭ হাজার টন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথাপিছু বছরে তখন হবে ২২০ কেজি। ঢাকা শহরে মোট উৎপাদিত বর্জ্যের কেবলমাত্র শতকরা ৩৭ ভাগ সংগ্রহ করা হয়। বাকি পড়ে থাকে আবাসিক এলাকা, স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে, পথে-ঘাটে, নদী-খালে। যেগুলো সংগৃহীত হয় সেগুলোর একটি বড় অংশও জমিভরাট বা খাল-নদী দখলের কাজে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমান পর্যায়ে বাংলাদেশে শিল্প বর্জ্য ও মেডিক্যাল বর্জ্য প্রধান হুমকি, এর সাথে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের বাজারের অনুষঙ্গ ক্রমবর্ধমান পরিমাণে প্লাস্টিক ও পলিথিন। এর প্রধান শিকার নদী ও জলাভূমি, সেই সঙ্গে বাতাস। গত দুদশকে বাংলাদেশে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ হয়েছে। বাংলাদেশে কমবেশি ৩০ হাজার ছোটবড় কারখানা আছে। এসব কারখানার অনেকগুলোই ৪০টিরও বেশি ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। গার্মেন্টস ছাড়াও ওষুধ, রসায়ন, প্লাস্টিক, জুতা, সিমেন্ট, সিরামিকস, ইলেকট্রনিকস, খাদ্যসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিনিয়োগ হয়েছে। তবে এসব শিল্পের বিকাশ যথাযথ নিয়ম মেনে হয়নি, কারখানা করতে গিয়ে বন উজাড় হয়েছে, জলাভূমি ভরাট হয়েছে, কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাও যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কারখানা বর্জ্য অবাধে নদী নালা খালবিল দূষণ করছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরে অবস্থা সবচাইতে খারাপ। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী সবই বর্জ্যের গন্তব্য। বুড়িগঙ্গা নর্দমায় পরিণত হয়েছে, অন্য অনেক নদীও সেই পথে। শ্রমিক মজুরি, জীবন ও কাজের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ কোনো কিছুই ন্যূনতম মানে পৌঁছাতে পারেনি। কারখানার দূষণ কমানোর জন্য অপরিহার্য ইটিপি বসানো বা চালু রাখার কোনো আগ্রহ নেই কারখানা-মালিকদের। ব্যক্তিমুনাফার লোভে উন্মাদ হতে পারে, কিন্তু এসব বিষয় নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের, শ্রম ও পরিবেশ অধিদপ্তরের। কিন্তু তদারকির এসব প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর দুর্বল রাখা হয়েছে। কারখানা পরিদর্শকের অভাব প্রকট। এর কারণে গড়ে উঠেছে অনেক অবৈধ কারখানা, কিংবা বৈধ কারখানার অবৈধ তৎপরতা। আবাসিক এলাকায় মজুদ করা হচ্ছে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, অবৈধভাবে চলছে প্লাস্টিক, ফ্যান সহ নানা কারখানা। গত কিছুদিনে তার ফলাফল আমরা দেখলাম-নিমতলী, কেরানিগঞ্জ, গাজীপুর...। কারখানার শ্রমিকেরা মারা যাচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন এলাকাবাসী। এসব অকাল মৃত্যুর পর সরকার থেকেই স্বীকার করা হচ্ছে এগুলো অবৈধ ছিল, কিন্তু বছরের পর বছর অবৈধ তৎপরতা যে চললো তার দায়িত্ব স্বীকার করে সরকারের কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, তদারকি ব্যবস্থা ঠিক করার কোনো উদ্যোগও নেয়া হয়নি। পানি দূষণ এসব অনিয়ন্ত্রিত কারখানার অন্যতম পরিণতি। মশা, ডেঙ্গু, শ্বাসকষ্টসহ নানা অসুখ, দুর্গন্ধ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। সামগ্রিক নিরাপত্তাহীনতা তো আছেই। দেশজুড়ে ইটের ভাটা, বেশিরভাগই অবৈধ। সেইসাথে চলছে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ অব্যবস্থাপনা। এগুলোর কারণে ঢাকার বাতাস এখন বিশ্বে সবচাইতে বেশি দূষণের রেকর্ড করেছে।

মেডিক্যাল বর্জ্য আরও বিপজ্জনক। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এর শতকরা অন্তত ২০ ভাগ সংক্রামক ব্যাধির উৎস। অব্যবস্থাপনার কারণে এগুলো পয়ঃনিষ্কাশন লাইন বা ড্রেনে জমা হয়। রাজধানী বাদে বাংলাদেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে এখন প্রায় ১৪০০ হাসপাতাল/ক্লিনিক আছে, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ২০ টন মেডিক্যাল বর্জ্য তৈরি হয়। ডেইলি স্টারের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এগুলোর সংগ্রহ ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনার কোনো অবস্থা নেই। এসব বর্জ্য খোলা জায়গায় পড়ে থাকে, পানি-বাতাস দূষিত হয়। এগুলো থেকে এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি ও সি সহ বিভিন্ন কঠিন অসুখ ছড়াতে পারে। অন্য বর্জ্যের মতোই এসব বর্জ্যও নিচু জমি ভরাটের কাজে ব্যবহার করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিলেটে হাওরের পাশে, বরিশালে সন্ধ্যা নদীর সাথে যুক্ত খালের পাশে এসব বর্জ্য শেষ পর্যন্ত নদীতে গিয়ে পড়ছে। (*ডেইলি স্টার*, ২৯ নভেম্বর ২০১৯)

বেশিরভাগ বর্জ্য সংগ্রহ স্থানীয় এনজিও, ব্যবসায়ীসহ বেসরকারি সংস্থা/ক্লাবই করে। সিটি কর্পোরেশন বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার সমন্বিত ব্যবস্থাপনার কোনো অস্তিত্ব নেই। মেডিক্যাল ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট এন্ড

প্রসেসিং) রুলস ২০০৮ অনুযায়ী, 'কোনোভাবেই মেডিক্যাল বর্জ্য অন্য কোনো বর্জ্যের সাথে মেশানো যাবে না।' সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারাও এসব বিষয়ে অবগত নন। এই আইন প্রয়োগের জন্যও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কে চালাবে, কীভাবে বাস্তবায়ন হবে তা পরিষ্কার হয়নি। আইনে অনেক স্ববিরোধিতাও আছে। কে করবে, সিটি কর্পোরেশন না পরিবেশ মন্ত্রণালয় সেটাও পরিষ্কার জানেন না।

তবে সকল বর্জ্যই বর্জনীয় নয় বা বিশেষত জৈব বর্জ্য নিজেই সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশি, সেকারণে জৈব বর্জ্য পরিমাণের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তৈরি হয়। এই বর্জ্য বাতাস পানি মাটি দূষিত করার বদলে ব্যবহার করা সম্ভব জৈবসার, বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্জ্য থেকেই বাংলাদেশে ১ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া জৈব সার, বায়োগ্যাস তো আছেই। কিন্তু বর্জ্য সংগ্রহ, তা পৃথকীকরণ এবং বৃহৎ প্রকল্পের মাধ্যমে তাকে সম্পদে পরিণত করার কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা দেখা যায় না।

বর্জ্যবান্ধব উন্নয়ন

বাংলাদেশে উন্নয়ন যে ধারায় হচ্ছে তা অদূরদর্শী, ব্যক্তিমুনাফাকেন্দ্রিক, পরিবেশ-বিধ্বংসী এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে অন্ধ। এর ফলে সামনের দিনে আরও ভয়াবহ বর্জ্য বাংলাদেশকে দীর্ঘস্থায়ী বিপদে ফেলতে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই হুমকি মোকাবিলার জন্য যে যে ব্যবস্থা নেয়া দরকার তার বিপরীত দিকে চলছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান আঘাত পড়বে উপকূল জুড়ে। সেই উপকূলে ব্যাপক বনায়নসহ প্রাকৃতিক সুরক্ষা জোরদার করার বদলে কক্সবাজার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য মাত্রায় কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প করা হচ্ছে যাতে পুরো উপকূল ছারখার হবে, তার প্রতিরোধশক্তি কমে যাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশের বিপদ বাড়বে বহুগুণ বেশি।

কক্সবাজার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসাধারণ কেন্দ্র, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদসৈকত ছাড়াও এখানে আছে প্রাণবৈচিত্র্যের আধার, আছে অতুলনীয় বাস্তুসংস্থান। অথচ এই অঞ্চল ঘিরেই সরকার ১৭টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করছে, তার মধ্যে ১৩টি মহেশখালী ও মাতারবাড়ীতে। প্রতিবছর এসব কেন্দ্র থেকে ৭ কোটি টন কার্বন নিঃসরণ হবে, সাথে আরও বহুরকম বিষাক্ত উপাদান। এই অঞ্চলের মানুষের মৎস্য, লবণ ও পর্যটনকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকা সবই বিপর্যস্ত হবে।

উপকূলের আরেক প্রান্তে বিদ্যমান উন্নয়নযাত্রার ঝুঁকির সবচাইতে স্পষ্ট উদাহরণ সুন্দরবনবিনাশী রামপাল প্রকল্প। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ভয়ংকর আক্রমণের মধ্যে সুন্দরবনই উপকূলের মানুষদের প্রধান ভরসা। এই সুন্দরবনের জন্যই বারবার বাঁচে কোটি মানুষের জীবন ও সম্পদ। গত ৯ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল আবারও প্রত্যক্ষ করেছে সুন্দরবনের এই শক্তি। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তিন দিক জুড়েই ছিল সুন্দরবন। সুন্দরবনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের নিজস্ব শক্তি কমে আসে, ফলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। সুন্দরবন তাই এবারও বাঁচাল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও সম্পদ। অথচ 'উন্নয়নের' নামে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথভাবে আর তাদের দেশি-বিদেশি সহযোগীরা এই সুন্দরবনকেই নাই করে দিতে উদ্যত। পুরো উপকূল জুড়ে একের পর এক যেসব কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হচ্ছে তাতে ভারত ছাড়াও যুক্ত আছে চীন ও জাপান। এই সবগুলো দেশই নিজ নিজ দেশে কয়লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর পরিত্যক্ত কয়লা বিদ্যুতের বর্জ্যের ভাগাড় তৈরি করছে বাংলাদেশে।

গোটা বিশ্বেই এখন সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত। লোকসানে রয়েছে বিশ্বের বহু কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। বেশি খারাপ অবস্থায় আছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন, ইউরোপ ও রাশিয়ার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতের কয়লা বিদ্যুৎ ইউরোপের তুলনায় শতকরা ৫০ থেকে ১২০ ভাগ বেশি দূষণকারী।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের শাসকদের সাফল্য প্রচারণায় তার অন্যদিকটি বারবার ঢাকা পড়ে যায়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, কয়লাদূষণে ভারতে গড়ে প্রতিবছর ১ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দ্য ল্যানসেট-এর 'গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজেস স্টাডি'-তে বলা হয়েছে ভারতে মৃত্যুর প্রথম দশটি কারণের মধ্যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত দূষণ অন্যতম। ভারতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত দিকগুলো দিনে দিনে পরিষ্কার হবার ফলে এর বিরুদ্ধে জনমতও শক্তিশালী হচ্ছে। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের প্রযুক্তি সহজ ও সুলভ হওয়ায় নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের দিকে মনোযোগ অনেক বেড়েছে। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র-র ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কারণেই গত এক দশকে পরিবেশ আইনে একাধিক নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে, এসব প্রকল্প বিষয়ে রায় দেবার জন্য গ্রিন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। যার কারণে গত ৫ বছরে এনটিপিসিরই বেশ কয়েকটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুমোদন পায়নি। এই নির্দেশনা মানলে রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে পারত না এনটিপিসি। অথচ বাংলাদেশে সুন্দরবনসহ বাংলাদেশকে বিপর্যস্ত করে এরকম প্রকল্প করা হচ্ছে, বিষাক্ত বর্জ্য যার স্থায়ী পরিণতি।

পারমাণবিক বিদ্যুতের ঝুঁকি ও বিপদের যে কোনো সীমা-পরিসীমা নেই তা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের মতো ঘন জনবসতি, পানি ও আবাদি জমির ওপর বিপুল ভাবে নির্ভরশীল একটি দেশে এই ঝুঁকি বিশ্বের যে কোনো দেশের চাইতে অনেক বেশি। এই সত্য অগ্রাহ্য করে রূপপুরে বাংলাদেশের সবচাইতে ব্যয়বহুল পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প করা হচ্ছে। উপকূল অঞ্চলে আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রেরও প্রস্তুতি চলছে। পারমাণবিক বর্জ্য আর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের জন্য তৈরি হচ্ছে মহাবিপর্যয় ও জাতীয় নিরাপত্তাহীনতার হুমকি।

সাধারণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র যেখানে অবিশ্বাস্য মাত্রায় ব্যর্থ সেখানে তারা দেশের ওপর চাপাতে যাচ্ছে কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ বর্জ্যের ভয়ংকর বোঝা।

বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বর্জ্য পাহাড়

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের মতো প্রাথমিক পর্যায়ের বর্জ্য নিয়ে ভয়ংকর অব্যবস্থাপনা দেখা যায় না। কিন্তু এসব দেশে পুঁজির আধিপত্যের মধ্য দিয়ে শিল্প বর্জ্য, পারমাণবিক বর্জ্য, প্লাস্টিক, ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের পাহাড় তৈরি হচ্ছে। এর অনেকগুলোই বিদেশি 'সাহায্য' আর বিদেশি বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে স্থানান্তর করছে বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ দেশগুলোতে।

গত শতকের বিশ দশকে স্টুয়ার্ট চেজ পুঁজিবাদের অধীনে বর্জ্য উৎপাদনের চারটি উৎস চিহ্নিত করেছিলেন। এগুলো হল: (১) শ্রমশক্তি ব্যবহার করে বিষাক্ত বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিসেবা উৎপাদন (২) বেকারত্বের কারণে শ্রমশক্তির অপচয় (৩) অপরিকল্পিত দ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণ থেকে অদক্ষতা ও অতিউৎপাদন এবং (৪) প্রাকৃতিক সম্পদের অতিব্যবহার এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্জ্য।

এরপরে আরও সময় গেছে। পুঁজির গতিতে যুদ্ধসহ বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিক উৎপাদন ছিল ২০ লাখ টন, ২০১৬ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টনে। এর মধ্যে ১৩ কোটি টন শেষ পর্যন্ত গিয়ে সমুদ্রে জমা হয়। প্লাস্টিক সামগ্রীর এই উচ্চহারে বৃদ্ধির পেছনে আছে সুপারমার্কেটে সাজানো পণ্যের প্লাস্টিক প্যাকেজিং এবং 'ওয়ান টাইম' সামগ্রীর অনুপাত বৃদ্ধি। প্রতিবছর এসব মার্কেটই ব্যবহার করে ৮ লাখ টন প্লাস্টিক প্যাকেজ সামগ্রী। এসব প্লাস্টিক ও প্যাকেজিংএর জন্য ব্যবহৃত কাগজ উৎপাদনও জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। এক হিসাবে দেখা যায় চারটি প্লাস্টিক বোতল উৎপাদনে যে পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হয় তা পেট্রলচালিত একটি মাঝারি গাড়ির ১ মাইল যাত্রা থেকে সৃষ্ট গ্যাসের সমান।

এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৪০০ কোটি টন। বহু শিল্পোন্নত দেশ এখন রিসাইক্লিং বা পুনউৎপাদনের জন্য তাদের প্লাস্টিক বর্জ্য প্রান্তিক দেশগুলোতে রপ্তানি করছে। ২০১৭ সালে নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত চীনই ছিল এসব প্লাস্টিক পণ্যের প্রধান ক্রেতা। এখন এসব পণ্যের প্রধান গন্তব্য হচ্ছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বেশিরভাগ প্লাস্টিক পণ্য নদীতে এবং সেই সূত্রে সমুদ্রে গিয়েই জমা হয়। এই চারটি দেশকেই এখন সমুদ্রে প্লাস্টিক জমার জন্য প্রথম দশটির মধ্যে গণ্য করা হয়।

কয়েকবছর আগে নিউইয়র্ক টাইমস হিসাব করে দেখিয়েছিল শুধু বিলাসদ্রব্যের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রে ২০১২ সালে খরচ হয়েছে ৩০২ বিলিয়ন ডলার। অক্সফামের এক সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ১০ ভাগ সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিরা গ্রিনহাউজ গ্যাসের অর্ধেকটার জন্যই দায়ী। আরেক হিসাবে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশই অপচয় হয় এবং বর্জ্য হিসেবে পরিণতি লাভ করে। বৈশ্বিক হিসাবে মোট খাদ্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশই অপচয় হয় যার পরিমাণ প্রায় ২শ কোটি টন, টাকার অংঙ্কে যার দাম প্রায় ১ ট্রিলিয়ন বা ১ হাজার বিলিয়ন ডলারের সমান (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি)। খাদ্যের অপচয়ের অর্থ এর উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত পানি, শ্রমশক্তি, জ্বালানি, কাঁচামাল, পরিবহণসহ বহুরকম সামগ্রীর অপচয়।

সমরাস্ত্র উৎপাদন, সামরিকীকরণ এবং যুদ্ধ হচ্ছে সম্পদ অপচয় ও বর্জ্য উৎপাদনের সবচাইতে বড় এবং বিধ্বংসী উৎস। মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবচাইতে বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে, তারাই একক বৃহত্তম প্রাতিষ্ঠানিক দূষণকারী। মার্কিন সরকার যত জ্বালানি ব্যবহার করে তার ৮০ শতাংশই ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দেশি পরিবেশ বিধির আওতামুক্তই থেকে যায়।

পারমাণবিক বর্জ্য আরও ভয়াবহ বর্জ্যের পাহাড় তৈরি করছে বিশ্বে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বোমা, ইউরেনিয়ম খনি উত্তোলন, এসব কেন্দ্র করে সামরিক বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে যে বর্জ্য উৎপাদিত হয় তা বিপজ্জনক মাত্রায় পানি, মাটি সহ পরিবেশকে সমাধান-অযোগ্য মাত্রায় নষ্ট করছে। এসব ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অপরাধী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, সরকারি হিসাবেই কয়েক কোটি টন রেডিওএকটিভ বর্জ্য, কয়েক লাখ টন ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি মজুত হয়ে আছে। বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক বর্জ্য কীভাবে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় রাখা যাবে কিংবা এগুলোর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে তার কোনো সন্তোষজনক সমাধান এখনও পাওয়া যায়নি।

এছাড়া দ্রুতগতিতে ইলেক্ট্রনিক পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রতিবছর প্রায় ৫ কোটি টন ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি কম্পিউটর বাতিল করা হয়, ইউরোপে ১০ কোটি ফোন বাতিল

হয়। এর ১৫-২০ শতাংশ পুনঃউৎপাদনে যায় বাকি পুরোটাই জমে মাটিতে, পানিতে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের স্থান। দেশের ভেতরে তার ই-বর্জ্য তৈরি হয় ৩০ লাখ টনেরও বেশি। এর পরিমাণ বৃদ্ধি বিশ্বের প্রাণপ্রকৃতির জন্য হুমকি হয়ে ওঠছে।

পুঁজির গতিতে জিডিপি বাড়ছে, ধনীদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, জৌলুস বাড়ছে আর পুরো বিশ্ব বর্জ্যের পাহাড়ে চাপা পড়ছে, অপচয় আর প্রাণ প্রকৃতি মানুষ বিধ্বংসী তৎপরতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুঁজিবাদের আসল চেহারা। জলবায়ু পরিবর্তনসহ সমুদ্র, নদী মহাবিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিপদ বাড়ছে আরও বেশি।

[লেখক: সমাজবাদী চিন্তক ও প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।]

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

বি. ডি. রহমত উল্লাহ

পটভূমি

কোনো শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার পেছনে একটি রাজনৈতিক অর্থনীতি থাকে। আমাদের মতো তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' দেশগুলোতে পৌর বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে যা চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা হল আইন না মানা বিশৃঙ্খল এক রাষ্ট্রেরই বিবর্ণবাস্তব প্রতিচ্ছবির একটি স্পষ্ট অবয়ব। কেন তা এভাবে লিখলাম !! তা বিস্তারিত আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে। আমরা জানি এবং দেখতে পাচ্ছি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে দ্রুত নগরায়নের একটি সম্পর্ক আছে। এটাই সাধারণভাবে অনুমিত ধারণা, যৌক্তিক প্রথাসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত তো বটেই। কিন্তু আমাদের মতো বিচারহীনতার দেশে, দায়বদ্ধতা যেখানে প্রশ্নবিদ্ধাকারে অনুপস্থিত সেসব দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানেই গ্রামকে এক অবিশ্বাস্য রকমের পেছনে ফেলে রেখে নগরকে বেহিসেবিভাবে ত্বরিত গতিতে ধনী করে তোলার এক নিষ্ঠুর নাটক বৈ অন্য কিছু নয়। আর এ ধরনের ধনী হওয়ার পিছনে নানা রকমের কল্পকাহিনি থাকলেও এখানে তা নিয়ে আলাপ করছি না, করার সুযোগও নেই। যে বিষয়টির ওপর আলাপ করছি সে বিষয়টি হল 'এ জলদি' রকমের ধনী লোকগুলোকে দৈনন্দিন জীবনাচার যেখানে কাটে সে শহরের উৎপাদিত 'বর্জ্য' কী হাল হকিকতে আছে, তার ব্যবস্থাপনা কী রকম সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা।

'অর্থনীতি','ত্বরিৎধনী', 'শহর-গ্রামের বৈষম্য', 'বিচারহীনতা', আর 'দায়বদ্ধতা' ইত্যাদির সাথে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দীনতার একটি নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টিই রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রসঙ্গটি নিয়ে আসে। এ জন্য এ কথাটি দিয়েই লিখাটি শুরু করেছিলাম । এখন তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি।

প্রাসঙ্গিকতা

'ত্বরিত' ধনী হওয়া লোকগুলো সঙ্গত কারণেই নিজেরা বাঁচতে এবং যাঁরা তাঁদের অবৈধ পথে উপরে উঠতে 'মই' দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের বাঁচাতে শহরে এসে গুচ্ছাকারে গলাগলি করে বসবাস করতেই ভালোবাসে। তাদের ধনী হওয়ার গতি, ভোগবিলাস আর রসনাবিলাসের গতির। ঊর্ধ্বশ্বাসের সাথে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেবাখাতসমূহের সেবার গতি প্রচণ্ড রকমভাবে ছন্দ হারিয়ে ফেলে। বলা যায়, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আবার এ 'ধনীরা'ই কিন্তু যাবতীয় সেবাখাতসমূহের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। সুতরাং কে কাকে শাসন করবে !! ধনী হওয়া লোকগুলোর শহরে বসবাস মানেই ঐ এলাকায় ভোগবিলাস বৃদ্ধি। লোকজনের আয় বৃদ্ধি মানে প্রচুর ব্যয়, প্রচুর ভোগ আর স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর বর্জ্যের উৎপত্তি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাম্প্রতিকতম পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে এক অসম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, যা কিন্তু শহরকেন্দ্রিক, শহরকে ঘিরেই তার ব্যাপ্তি। এই শহরকে, শহরের মানুষের আয় বৃদ্ধিতে গ্রামের লোকজন দিনান্ত পরিশ্রম করে কিছু না পেলেও তাদের পরিশ্রমে শহরের লোকজন এক ভোগবিলাসী দিনযাপনের মধ্যে দারুণ ফুর্তিতে কাল অতিবাহিত করছেন। নগরায়নের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি আর শহরে লোকসমাগমের প্রাচুর্য অনেক সৃষ্ট সংকটের মতো বর্জ্যও অসামান্য এক নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে। শহরে লোকের আধিক্য ও প্রায় সব ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের বসবাসের কারণে অধিকহারে বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে যা সামাল দেবার মতো শহরগুলোর পৌরসভার যথাযথ সক্ষমতা নেই। শহরে বসবাসকারী অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার দেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক হিমশিম অবস্থায় আছে। আধুনিক পুঁজিবাদী কয়েকটিরাষ্ট্র ব্যতীত তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ শহরেরই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এমন নাজুক অবস্থায় আছে যে তা শুধু মানুষের স্বাস্থ্য বিবেচনায় নয়, মানুষের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এক চরম ব্যর্থতা বই অন্য কিছু বলা যায় না। যার ফলে এ ধরনের ব্যর্থ বর্জ্য ব্যবস্থাসম্পৃক্ত শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের বিষয়ে এটা বলা যায় যে বসবাসকারী নাগরিকদের স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা, ক্লান্তিকর বিষণ্নতাসহ সব ধরনের জটিলতা নিয়েই তাদের বসবাস করতে হচ্ছে। বিশ্বে পৌর বর্জ্যের এ দুরবস্থায় প্রায় ৩০০ কোটি লোক দিন কাটাচ্ছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের শহরেই পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ সংকট দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। এ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকরা নির্বাচনের সময়ে অনেক শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত সেই 'খাড়া বড়ি থোর' হিসেবেই থেকে যাচ্ছে। এতে নাগরিকরা তো ভুগছেনই, তাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বও কিন্তু খুব স্বস্তিতে নেই। জনগণের প্রশ্নবাণে নানা রকমভাবে জর্জরিত হওয়ার মতো ঘটনা নিত্যই ঘটছে। এ সংকটের যথাযথ সমাধান করতে না পেরে তাদেরও নানা রকমের টালবাহানা করতে হচ্ছে। এ ধরনের বিপর্যস্ত অবস্থাসম্পৃক্ত বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে আমরা এবার একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এটা খুব সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খুবই নাজুক অবস্থায় আছে। তা ঢাকায় হোক এবং দেশের যেকোনো প্রান্তের একটি ছোট্ট শহরেই হোক যাই বলি-না

কেন তার আগে আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বিষয়টার ওপর একটি সাধারণ ধারণা নিতে চেষ্টা করি ।

বিশ্বের সব ধরনের শহরে সাধারণত নিম্নে বর্ণিত স্থান থেকে বর্জ্য উৎপাদিত হয়:-

(ক) সাধারণ গৃহস্থালির বর্জ্য
(খ) হোটেল/রেস্তোরার বর্জ্য
(গ) বাণিজ্যিক দোকানপাটের বর্জ্য (ঘ) শিল্প বর্জ্য
(ঙ) হাসপাতাল/ক্লিনিকের বর্জ্য
(চ) রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, নদীবন্দর, লঞ্চঘাট ইত্যাদি থেকে উৎসর্গীকৃত বর্জ্য ।
(ছ) ভবন, স্থাপনা নির্মাণ কিংবা ভবন নবায়ন/ভাঙার বর্জ্য ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কার্যপদ্ধতিতে পর্য্যয়ক্রমিকভাবে দুটি ধারা বা পদ্ধতি রয়েছে ।

(১) প্রথমস্তরে বর্জ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ডিপো বা প্ল্যান্টে আনা ।

(২) দ্বিতীয় স্তরে সংগৃহীত বর্জ্যগুলো নির্ধারিত কৌশল ব্যবহার করে তাকে অন্য পণ্য বা শক্তিতে দক্ষ ভাবে রূপান্তর করে ব্যবহার-উপযোগী করে গড়ে তোলা ।

এর মধ্যে দুটো কাজই খুব জটিল প্রকৃতির । তবে অসম্ভব নয় । বলতেই হয় সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ ও ডিপো বা প্ল্যান্টে স্থানান্তর প্রক্রিয়াটা বেশ জটিল এবং কষ্টসাধ্য । সঠিক ও যথাযথভাবে বর্জ্য সংগ্রহের ওপর দ্বিতীয় ভাগের কর্মকৌশল সম্পাদনের ব্যর্থতা বা সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে । বর্জ্যকে ব্যবহার করে অন্য পণ্যে বা শক্তিতে রূপান্তর বা বর্জ্য থেকে প্রাপ্তব্য অন্য পণ্য নির্বাচনে রাষ্ট্রের কোনো নির্দিষ্ট চাহিদা বা প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েও অনেকসময় দ্বিতীয় স্তরের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় । যেমন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যদি বিদ্যুৎ উপাদনই যৌক্তিক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় । সেক্ষেত্রে বর্জ্য পুড়িয়ে গ্যাস বানিয়ে বিদ্যুৎ বা জ্বালানি সৃষ্টির করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় থার্মাল পদ্ধতি । আবার কোনো রাষ্ট্রের হয়তো-বা সার কিংবা কারো ভূমি ভরাটের প্রয়োজন থাকতে পারে । সেক্ষেত্রে মাটিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্টসময় বর্জ্যকে রেখে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করে সার উৎপাদন কিংবা সরাসরি ভূমি ভরাটের জন্য বর্জ্যগুলোকে স্তূপাকারে জমা করা হয় । এটাকে বলা হয় নন-থার্মাল পদ্ধতি । এ কথাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখলে যা দাঁড়ায় তা হল, জাতীয় লক্ষমাত্রা নির্ধারণের পর বর্জ্য সংগ্রহ থেকে পণ্য রূপান্তর পর্যন্ত কর্মকৌশল বা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে প্রধানত নিচের দু'টি কৌশল বিবেচনা করে এগোতে হবে । আমরা সংগৃহীত বর্জ্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ডিপোতে এনে,

(১) বর্জ্যগুলিকে পুড়িয়ে থার্মাল পদ্ধতিতে উষ্ণতা বৃদ্ধি করে উৎপাদিত গ্যাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করব, নতুবা (২) বর্জ্যগুলোকে নন-থার্মাল পদ্ধতিতে [শীতল পদ্ধতি] পচন প্রক্রিয়ায় সার ও গ্যাস [মিথেন] বানাব কিংবা শুধুমাত্র জমি ভরাট করব সে বিবেচনায় পরবর্তী কার্য্যক্রম নির্ধারণ করব ।

মূলত দুটি কৌশলের যেটিই ব্যবহার করি-না কেন বর্জ্য সংগ্রহের কাজটি কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় একটি অত্যন্ত উঁচুমানের কাজ হতে হবে । বার বার কেন বর্জ্য সংগ্রহের কাজটিকে গুরুত্ব দিচ্ছি তা পুরো কার্য্যক্রম পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যাবে ।

শহরের পৌর বর্জ্য কোন কোন স্থান থেকে উৎসারিত হয় তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যেমন তরিতরকারিসহ নানারকম জৈব বর্জ্য রয়েছে আবার হাসপাতাল, ক্লিনিক থেকে বিষাক্ত হ্যাজার্ডাসসহ লোহালক্কড়, সিমেন্ট, প্লাস্টিক, কাঠ, কাপড়, উত্তপ্ত বা হঠাৎ ঘর্ষণে আগুন লেগে যেতে পারে এ ধরনের পেট্রোল, অকটেনের ক্যান ইত্যাদি নানা ধরনের পদার্থের সংমিশ্রণসম্পৃক্ত বর্জ্যও আছে। কাজেই বর্জ্য সংগ্রহে আমাদের নজর দিতে হবে যেন আমরা শতভাগ বর্জ্য সংগ্রহ করে আনতে পারি। কারণ আমরা স্পষ্টতই লক্ষ করি কিছুটা বর্জ্য যদি পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে যায়, দ্বিতীয় স্তরে বর্জ্য পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য যদি পুরোটা সংগ্রহ না করি তাহলে প্রথমত; আমরা যে পরিমাণ বর্জ্য দিয়ে কাজ করব বলে হিসাব করেছিলাম এখন আমাদের সংগ্রহে বর্জ্য যদি কম হয় তাহলে দ্বিতীয় ধাপের কার্য্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যাবে না। আবার হ্যাজার্ডাস ও দূষিত বর্জ্যে যে বিষাক্ত পদার্থগুলো রয়েছে তা মাটিতে পড়ে থাকলে, চুইয়ে চুইয়ে ভূতলে পানির স্তরে, নদী, পুকুর, খাল-বিলের পানিতে, জমিতে মিশে গিয়ে আমাদের প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। এছাড়াও বর্জ্য থেকে উৎসারিত বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে নিত্য আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে নানারকম অসুখ-বিসুখের সৃষ্টি করবে । ফেলে দেওয়া বর্জ্য বা রাস্তাঘাটে স্তূপীকৃত বর্জ্যের দূর্গন্ধে চলাফেরা যে কত অস্বস্তিকর, সুস্থ মানসিকতাকে কিভাবে বিষণ্ন করে তোলে তা আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন পৌরসভার 'কৃতিত্বে' ভাঙা ট্রাক-লরি দিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের সময় রাস্তাঘাটে ছিটকে পড়া বর্জ্য থেকে তো তা নিয়তই উপলব্ধি করছি। এখন আমরা যে দুটি পদ্ধতির কথা বললাম সেগুলো একটু বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি। প্রথমে আমরা থার্মাল পদ্ধতির বিষয়ে জানতে চেষ্টা করি।

থার্মাল পদ্ধতিতে [উষ্ণতায় রূপান্তর প্রক্রিয়া] মূলত নিচের কৌশলগুলো ব্যবহার করে বর্জ্য দিয়ে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি উৎপাদন করা যায়।

(১) ইনসিনারেশন
(২) গ্যাসীয়করণ
(৩) পাইরোলাইসিস
(৪) প্লাজমা আর্ক গ্যাসীকরণ।

শীতল পদ্ধতি রূপান্তর করে নিচের কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়।

(১) অ্যানারোবিক ডাইজেশন
(২) স্যানিটারি ল্যান্ডফিল
(৩) ল্যান্ডফিল্ড

থার্মাল পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(১)ইনসিনারেশন

এই পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রার বয়লারে স্টিম উৎপাদন করার লক্ষ্যে বর্জ্যগুলোকে জ্বালানো হয়। উল্লেখ্য যে জালাবার আগে হ্যাজার্ডাস বা বিষাক্ত, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি বর্জ্যসমূহকে বাছাইকরণ যন্ত্রের সাহায্যে ফিল্টার করে পৃথক করা হয়। এ বিষাক্ত বর্জ্যগুলোকে বাছাই করে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা হয়। এভাবে উৎপাদিত উষ্ণ বাষ্প দিয়ে স্টিম জেনারেটরের মাধ্যমে

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় । সাধারণ হিসাব অনুযায়ী ১০০ টন বর্জ্য দিয়ে প্রায় ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় । ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে ফ্লু গ্যাস, তাপ আর ছাই উৎপাদিত হয় । স্টিম টারবাইন থেকে নির্গত বাষ্প পুরোপুরি শীতল ঘনীভূত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আংশিক বা সম্পূর্ণটা ব্যবহার করা যায় অথবা অন্যকোনো প্রয়োজনীয় তাপব্যবহারযোগ্য যন্ত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে । ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলা যায় বলে জমি নষ্ট হচ্ছে না । আর বিষাক্ত বর্জ্য রিসাইকেল করা হয় বিধায় উদগীরিত স্টিম বায়ুতে মিশে আবহাওয়াকে দূষিত করে না । এটা আমাদের দেশের জন্য যথাযথ কৌশল হতে পারে । উন্নত বিশ্বে অধিকাংশ দেশে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয় ।

(২) গ্যাসিফিকেশান

গ্যাসীয় বস্তু বা সিনগ্যাস উৎপাদনের লক্ষে বর্জ্যকে হ্রাসকৃত অক্সিজেন পরিমণ্ডলে আংশিক প্রজ্বলন করার প্রক্রিয়াকে গ্যাসিফিকেশন হিসেবে অভিহিত করা হয় । এই গ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়াটি 'ফিক্সড বেড', ফ্লুডাইজ্ড বেড কিংবা এনট্রেইন্ড বেডের হতে পারে । এ পদ্ধতিতে নির্গত গ্যাসে মিশ্রিত অবস্থায় কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইক্সাইড, জলীয় বাষ্প, [ঐ২ঙ], চারকোল, আলকাতরা ও হাইড্রোজেন থাকে । যা কম্বাসশান ইঞ্জিন, মাইক্রো টারবাইন্স, ফুয়েল সেল ও গ্যাস টারবাইন্সে ব্যবহৃত হয় ।

(৩) পাইরোলাসিস

পাইরোলাসিস হচ্ছে গ্যাসিফিকেশনের অন্য একটি ধরন যা নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বর্জ্য থেকে গ্যাস নির্গত করা হয় যা থেকে পাইরোলাসিস গ্যাস ও সলিড চারকোল উৎপাদিত হয় । নির্গত পাইরোলাসিস গ্যাসের তাপমান [হিটিং ভ্যাল্যু] বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ৫ থেকে ১৫ মে.জুল্স/মিটার কিউব পর্যন্ত হতে পারে । পাইরোলাসিস ৫০০° থেকে ৮০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জৈব বর্জ্যকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে গ্যাস ও শক্ত বস্তুতে পরিণত করে । মোটা দাগে পাইরোলাসিস হচ্ছে স্মোল্ডারিং যা দাহ্য জাতীয় বর্জ্য থেকে ৪০০° থেকে ৬০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্যাস উদগীরণ করে । পাইরোলাসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত ও বিভক্ত কার্বন অবশেষ ৮০০° থেকে ১০০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উন্নত পাইরোলাসিস তথা গ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়ায় বাষ্পে রূপান্তর করা হয় । ইনসিনারেশনও একধরনের পাইরোলাসিস যা কারিগরি কৌশলের ওপর নির্ভর করে গ্যাস এবং কোককে ইনসিনারেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে ।

(৪) প্লাসমা আর্ক গ্যাসিফিকেশান

প্লাসমা আর্ক গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতি হচ্ছে প্লাজমা ব্যবহার করে অর্থাৎ উচ্চ ভোল্টেজেরও বেশি মাত্রার কারেন্ট ব্যবহার করে ইলেকট্রোডের তাপমাত্রা বাড়িয়ে গ্যাসিফিকেশন করে জৈব বর্জ্যকে সিনগ্যাসে রূপান্তর করা যা প্রাথমিক ভাবে হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন-জাতীয় পদার্থ ।

নন-থার্মাল পদ্ধতিতে [শীতল পদ্ধতি] বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(১) অ্যানারোবিক ড্রাইজেশন
(২) স্যানিটারি ল্যান্ডফিল
(৩) ল্যান্ডফিল্ড

(১) অ্যানারোবিক ড্রাইজেশন

নন-থার্মাল পদ্ধতিতে অ্যানারোবিক ডাইজেশন হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অ্যানারোবিক ড্রাইজেশন হল অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বর্জ্যের ক্ষুদ্র জৈব অনুগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ভেঙে জৈবসত্তা হারিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন কার্যকরী গ্যাস বা জ্বালানিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সরল অর্থে প্রথমত বর্জ্যগুলোকে সংগ্রহ করে ডিপোতে এনে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভেঙে ফেলা হয়। এ ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়াতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি উপাত্তগুলো পাওয়া যায়। বর্জ্যতে যেসব অজৈব, বিষাক্ত, হ্যাজার্ডাস পদার্থ থাকে যেমন– সিমেন্ট, লোহা, ক্লিনিক্যাল, মেডিক্যাল বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি পৃথক করে সাবধানতার সাথে রিসাইকেল [পুনঃব্যবহারযোগ্য] করা হয়। যাতে ভূমি দূষণ, বায়ু দূষণ ও পানি দূষণ না ঘটে। বাছাই করার পর জৈব বর্জ্যগুলো অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফারমেন্টেশান করার মাধ্যমে গ্যাস, জ্বালানি ও সার উৎপাদিত হয়। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অ্যানারোবিক ডাইজেশান বর্তমান বিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উৎস। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত ।

(১) ল্যান্ডফিল্ড ও স্যানিটারি ল্যান্ডফিল

বর্জ্যের ল্যান্ডফিল পদ্ধতিতে দুইধরনের।

[ক] ল্যান্ডফিল্ড
[খ] স্যানিটারি ল্যান্ডফিল

ল্যান্ডফিল্ড

সাধারণভাবে বর্জ্য দিয়ে জমি বা ভূমি ভরাটের পদ্ধতিকে ল্যান্ডফিল্ড বলা হয়। এর প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে কোনো দেশের বা রাষ্ট্রের যদি জমির প্রয়োজন হয় তাহলে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে গর্ত ভরাট করে কিংবা নিচু জমিতে বর্জ্য ফেলে তা সম্পাদন করা হয়। এটি খুবই নিম্নমানের একটি পদ্ধতি। এতে বর্জ্যের বিষাক্ত অংশ থেকে লিচেট চুইয়ে চুইয়ে ভূ-তলে পানির স্তরে মিশে যায় ফলে আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড পানির স্তরে প্রাপ্য পানি দূষিত হয়ে যায়। শুধু এতই শেষ নয়। লিচেট চুইয়ে চুইয়ে নদী, খাল, বিল, হাওড় সহ জমিতে ছড়িয়ে পড়ে বিধায় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে আমাদের প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ল্যান্ডফিল পদ্ধতিতে বর্জ্য জমি ভরাটের জন্য ফেললে তাতে থাকবে হাসপাতাল, ক্লিনিক থেকে বিষাক্ত হ্যাজার্ডাসসহ লোহালক্কড়, সিমেন্ট, প্লাস্টিক, কাঠ, কাপড়, উত্তপ্ত বা হঠাৎ ঘর্ষণে আগুন লেগে যেতে পারে এধরনের পেট্রোল, অকটেনের ক্যান ইত্যাদি নানা ধরনের পদার্থের সংমিশ্রণসম্পৃক্ত পদার্থ। এছাড়াও বর্জ্য থেকে উৎসারিত বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে নিত্য আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে নানারকম অসুখবিসুখের সৃষ্টি করবে। ফেলে যাওয়া বর্জ্য বা রাস্তাঘাটে স্তূপীকৃত বর্জ্যের দুর্গন্ধে

চলাফেরা যে কত অস্বস্তিকর, সুস্থ মানসিকতাকে কিভাবে বিষণ্ন করে তোলে তা আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন পৌরসভার 'কৃতিত্বে' ভাঙা ট্রাক-লরি দিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের সময় রাস্তাঘাটে ছিটকে পড়া বর্জ্য থেকে তো তা নিয়তই উপলব্ধি করছি। সুতরাং বলা যায় এ ল্যান্ডফিল্ড পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সবচেয়ে বাজে, নিম্নমানের একটি পদ্ধতি। কোনো দেশের জনগোষ্ঠীকে 'স্লো-পয়জনিং' করে মারতে হলে এ পদ্ধতিটাই হল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ।

সেনিটারি ল্যান্ডফিল্ড

উপরে যেটি আলোচনা করা হল, যা, বিশ্বের সবচেয়ে নিম্নমানের, জন-জল-জলবায়ু বিনাশী– ল্যান্ডফিল্ড, যা আমরা আমাদের দেশে বাস্তবায়ন করতে দেখছি। এর কাছাকাছি হলেও বেশ কিছুটা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করেও যদি নিদেনপক্ষে ল্যান্ডফিলের উন্নতরূপের কার্যক্রমটা বাস্তবায়ন করা যায় তাহলেও দেশ আর জনগণ বর্জ্যসম্পৃক্ত এক মারত্মক সংকট থেকে উদ্ধার পেতো । এ কার্যপদ্ধতিটি সেনিটারি ল্যান্ডফিল্ড হিসেবে আখ্যায়িত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সে ধরনের কোনো সদিচ্ছা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। ল্যান্ডফিল্ড থেকে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড খুব বেশি যে ব্যয়বহুল তাও কিন্তু নয়। স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাধারণ ল্যান্ডফিল থেকে উন্নত ধরনের, আধুনিক ও নিরাপদ। স্যানেটারি ল্যান্ডফিলে পদ্ধতিতে ভূমি গভীর গর্ত করে প্রথমে একটি পলিথিন বা তরল কোনো পদার্থ চুইয়ে পড়বে না তা দিয়ে ঢেকে দিয়ে তার উপরে কাদা মেখে বর্জ্য ঢেলে দেয়া হয়। তারপর বর্জ্যকে ঢেকে দিয়ে নিরাপদ করা হয়। এতে বর্জ্য থেকে চুইয়ে চুইয়ে দূষিত লিচেটগুলো পানির স্তরে কিংবা নদীর পানিতে কিংবা জমিতে মেশার সুযোগ পায় না। এছাড়াও বর্জ্য থেকে উৎসারিত বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে নিত্য আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে নানারকম অসুখ-বিসুখের সৃষ্টি করবে না। ল্যান্ডফিল্ড পদ্ধতিতে বর্জ্য জমিনের উপর স্তূপ করে খোলাখুলিভাবে ফেলে যাওয়া বর্জ্য বা রাস্তাঘাটে স্তূপীকৃত বর্জ্যের দুর্গন্ধে চলাফেরা করতে অস্বস্তিকর ভাবটাও আর থাকবে না । মোট কথা, কোনো ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোনো দিকে যাবার সুযোগ পাবে না । যখন জমিগুলো ক্রমান্বয়ে ভরাট হয়ে উঠবে এর উপর পার্ক, খেলার মাঠ কিংবা কোনো স্থাপনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উন্নত বিশ্বে যেখানে জমির প্রয়োজন সেসব দেশে এই পদ্ধতিতে সেনিটারি ল্যান্ডফিল করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়।

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

যে কোনো দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হবে সে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ঐ দেশের বা এলাকার বর্জ্যের পরিমাণ, জনসংখ্যা, দৈনিক প্রতিজন কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদন করে, লোকজনের আর্থিক স্বচ্ছলতা, সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক অবস্থা, বর্জ্যের ধরন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সূচকের অবস্থা ও প্রক্ষেপণ বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবোধক স্টাডি করিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাংলাদেশের হাজারো পরিকল্পনার মতোসুন্দর ও মূল্যবান পরিকল্পনা কিন্তু এর পরে আর নেই। সুন্দর সমাপ্ত পরিকল্পনার অসম্পন্ন কাজ। এটাই আমাদের দেশের সরকারগুলোর দীর্ঘদিনের কু-অভ্যাস। যে ধরনের প্রকল্প জনবান্ধব, দেশবান্ধব, পরিবেশবান্ধব কিন্তু এতে কমিশন নেই, এর কমিশন থেকে বিদেশে বাড়ি বানানো যাবে না, এর উপার্জন বিদেশি ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না সেসব প্রকল্প হবে না। হবে অনেক কমিশন

পাওয়ার মতো প্রকল্প যেমন অ্যালিভেটেড এক্সপ্রেস, পদ্মা সেতু, দেশবিনাশী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রাণ-প্রকৃতি পরিবেশনাশী রামপাল কিংবা পায়রা, মাতারবাড়ি সহ আরো আরো কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য। পদ্মা সেতু কিংবা অ্যালিভেটেড এক্সপ্রেস দেশের ১৬ কোটি জনগণকে মাথায় লক্ষ কোটি ঋণের এক উটকো বোঝা ছাড়া আর কী দেবে বলুন। অথচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এমন একটি মানবহিতৈষী কাজ যা আর্থিক বা অর্থনৈতিক যে কোনো বিচারেই শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন হবে না ।

বাংলাদেশের মিউনিসিপাল সলিড বর্জ্য উৎপাদনের ওপর যেসব প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে, তার কয়েকটি ছক তথ্যসূত্রসহ প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিকতায় নিচে দেয়া হল

টেবিল-১: বাংলাদেশের শহরের মিউনিসিপাল বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ:

গাল	শহরের মোট জনসংখ্যা	শতকরা হারে শহরের (%) জনসংখ্যা	বর্জ্য উৎপাদন হার (কেজি/ব্যক্তি)	মোট বর্জ্য উৎপাদন (টন)
১৯৯১	২০৮৭২২০৪	২০.১৫	০.৪৯++	৮৭৩৫
২০০১	২৮৮০৮৪৭৭	২৩.৩৯	০.৫+++	১১,৬৯৫
২০০৪	৩২৭৬৫১৫২	২৫.০৮	০.৫+++	১৬.৩৮২
২০০৫	৫৩৭৮৫৩৬৯	৩৬.০০	০.৫+++	২৬,৮৭২
২০২৫	৭৮৪৪০০০০	৪০.০০	১.৬+++	৪৭,০৬৪

তথ্যসূত্র: এডিবিআই এবং এডিবি জুরব্রাগ ২০০২

উপরে বর্ণিত পার ক্যাপিটা বর্জ্য উৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্ষেপণসহ বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী কর্মকর্তাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কারণ বর্জ্যের পরিমাণ দেখে তাদের নির্ধারণ করতে হবে কী ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করতে হবে ও কী কৌশলে বর্জ্য ব্যবহার করে বর্জ্য থেকে অন্যকোনো শক্তিতে রূপান্তরের পদক্ষেপ নিতে হবে। এ টেবিলে ২০২৫ ইংরেজি পর্যন্ত প্রক্ষেপণ দেয়া আছে। তাতে প্রকল্প নির্মাণে প্রাক্কলন করতে ত্রুটি এড়ানো সম্ভব হবে ।

তবে শুধু বর্জ্যের পরিমাণই একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয় যার দ্বারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। এজন্যে বর্জ্য সংক্রান্ত আরো তথ্য প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিভিন্ন স্টাডির মাধ্যমে ইতোমধ্যে বর্জ্যের নানারকম তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে প্রয়োজনীয় ২/১টি পাঠকদের জন্য এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন হল।

টেবিল-২: বাংলাদেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের বর্জ্য উৎপাদনের ধরন ও পরিমাণ:

	প্রতিজন প্রতিদিন কী পরিমাণ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করে						
বর্জ্যের ধরন	ডিসিসি	ডসসিসি	কেসিসি	আরসিসি	বিসিসি	এসসিসি	
জৈব	৩৬৪৭	৯৬৮	৪১০	১২১	১০৫	১৫৮	৫৪০৯
কাগজ	৫৭১	১৩০	৪৯	১৫	৯	১৮	৭৯২
প্লাস্টিক	২৩০	৩৭	১৬	৭	৫	৮	৩০৩
বস্ত্র ও কাঠ	১১৮	২৮	৭	৩	২	৫	১৬৩
চামড়া ও রবার	৭৫	১৩	৩	২	১	১	৯৫
ধাতব	১০৭	২৯	৬	২	২	২	১৪৮
গ্লাস	৩৭	১৩	৩	২	১	২	৫৮
অন্যান্য	৫৫৫	৯৭	২৬	১৮	৫	২১	৭২২
মোট	৫৩৪০	১৩১৫	৫২০	১৭০	১৩০	২১৫	৭৬৯০
জনসংখ্যা [মিলিয়ন]	১১.০০	৩.৬৫	১.৫০	০.৪৫	০.৪০	০.৫০	
জনপ্রতি/দৈ:/ বর্জ্য উৎপাদন/ কেজি	০.৪৮৫	০.৩৬০	০.৩৪৭	০.৩৭৮	০.৩২৫	০.৪৩০	০.৩৮৭
ডিসিসি– ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, সিসিসি– চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কেসিসি– খুলনা সিটি কর্পোরেশন, আরসিসি– রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, বিসিসি– বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, এসসিসি– সিলেট সিটি কর্পোরেশন।							

তথ্যসূত্র : আলমগীর ও আহসান, ২০০৭

এ প্রতিবেদনে বার বার একটি কথা বলা হয়েছে যে সঠিক ও দক্ষতার সাথে বর্জ্য সংগ্রহ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ জেনে তা শতভাগ সংগ্রহ করে পরবর্তী কাজের জন্যই যে পরিমাণ বর্জ্য লাগবে শুধু তাই নয়, বর্জ্য যদি শতভাগ সংগ্রহ করে বিনে কিংবা প্ল্যান্টে না আনা হয় তাহলে যে পরিমাণ বর্জ্য এলাকায় এলাকায় থেকে যাবে বা সংগ্রহ হবে না তা থেকে উৎসারিত দূষিত পদার্থ প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ নষ্ট করবার জন্যে যথেষ্ট। মানুষকে, প্রাণকে, প্রকৃতিকে, পরিবেশকে বাঁচাতেই তো আমরা বারবার বলছি নিরাপদ ঢাকনাওয়ালা বাক্সতে ঢুকিয়ে বর্জ্য বাড়ি থেকে, হোটেল, মল, বন্দর থেকে কভার্ড ভ্যানে করে আনতে হবে।

নিচের ছবি-১ এতে দেখুন তো আমরা কী ধরনের গাড়ি ব্যবহার করে বর্জ্য আনছি ।

অর্থব্যয়ে এ ধরনের প্রকল্প বানিয়ে শুধু কমিশন খেয়ে জাতি ও দেশকে কি বিনাশ করা হচ্ছে না? ল্যান্ডফিল্ড যদিও আমাদের দেশের জন্য কোনোভাবেই যথাযথ নয় তথাপিও আমাদের এ কথাটি স্মরণ রাখা বোধ হয় যৌক্তিক যে বর্জ্য সংগ্রহ ও বর্জ্য পরিবহন সবক্ষেত্রেই ধরন এক এবং তা সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি থার্মাল কিংবা নন-থার্মাল যে পদ্ধতি অবলম্বন করুন-না কেন বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সব পদ্ধতির জন্যই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে একাজটি সম্পন্ন করতে হবে ।

পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে তা হল বর্জ্য সংগ্রহ ও বর্জ্য যথাযথভাবে পরিবহন করে ডিপো বা প্ল্যান্টে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্তূপীকৃত করা এবং পরিবহনের সময় সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন সামান্যতম বর্জ্যও কোনো স্থানে পড়ে বা থেকে না যায় ।

ছবি-১: ঢাকায় অনিরাপদ ট্রাক দিয়ে বর্জ্য পরিবহন করা হচ্ছে

সংগ্রহ ও পরিবহন অংশটির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা অবশ্যই যথাযথ, সঠিক ও উন্নত মানের বর্জ্যসংগ্রহের বাক্স, উন্নত ধরনের যানবাহন জোগাড় করব। এ আলোকে একটি ছবি [ছবি-২] নিচে দেয়া হল ।

ছবি - ২ : বর্জ্য সংগ্রহের ও পরিবহনের জন্য সঠিক মানের গাড়ি

একই কথা খাটে সংগৃহীত বর্জ্য আমরা কিভাবে অস্থায়ী ডিপোতে [বিন] রাখছি। ঐসব বিন বা বর্জ্য রাখার অস্থায়ী ডিপোগুলোকে অবশ্যই ঢাকনা আবৃত অবস্থায়, দূষিত পদার্থ বা বর্জ্যের কোনো অংশ যেন বাতাসে না মিশতে পারে বা দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে সেভাবে নির্মাণ করতে হবে। আমাদের চোখে বোধ হয় এটা খুব সহজেই দৃষ্টিকটু ঠেকে যে প্রায় সারা দেশে এমনকি খোদ রাজধানী ঢাকায়ও আমরা রাস্তাঘাটে বিভিন্ন এলাকায় মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট (বর্জ্য) বিনগুলোতে জঘন্যভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখি। নিচের ছবিগুলো [ছবি-৩ ও ছবি-৪] দেখে আমরা কি ঢাকা শহর কিংবা বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি?

ছবি-৩ : ঢাকায় নির্ধারিত বিনে বর্জ্য স্তূপীকৃত করে জমা রাখার দৃশ্য

আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে নিম্নমানের যে পদ্ধতি তা বাস্তবায়ন করছি। যা বর্ণিত সব ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের যাকে ল্যান্ডফিল্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ পদ্ধতিটা হল এলাকাভিত্তিক কিংবা ওয়ার্ডভিত্তিক বিভিন্ন কার্যাদেশপ্রাপ্ত দল ভ্যানগাড়ি/ছোট ট্রাকের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে ট্রান্সফার ডিপোতে নিয়ে আসে। প্রকৃত অর্থে এরা এ বর্জ্যগুলো বিভিন্ন বিনে এনে জমা করে। এটাকে বলে অস্থায়ী ডাম্পিং। ওখান থেকে বড় আকৃতির ট্রাক বা লরিতে করে সংগৃহীত ও জমাকৃত সব বর্জ্যগুলো নিয়ে যে জমি বা জায়গাটা ভরাট করতে হবে সেখানে নিয়ে গিয়ে ঢেলে ফেলে দেয়।

ছবি-৪ : ঢাকায় নির্ধারিত বিনে বর্জ্য স্তূপীকৃত করে জমা রাখার আরেকটি দৃশ্য

এ হল আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল রূপ। এখানে যে কাজগুলো সুচারুরূপে করার কথা ছিল তা হল অন্যান্য শৃঙ্খলার সাথে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় নিরাপদ ঢাকনাসহ ০.৫ কেজি/ ১.০ কেজি ওজনের বাক্সে ভর্তি করে কভার্ড ভ্যানে স্থানান্তর করে তারপর বিন বা প্ল্যান্টের নিয়ে যাওয়ার কথা। পরবর্তীতে ল্যান্ডফিল করতে হলেও তা ভর্তি করে পলিথিন কাদা মেখে বর্জ্য থেকে চুইয়ে চুইয়ে কোনো ধরনের দূষিত লিচেট যেন ভূতলে পানির স্তরে, নদীর জলে কিংবা জমিতে না মেশে সে পদক্ষেপ নিয়ে ল্যান্ডফিল করার কথা। এর কোনোটা কি হচ্ছে? ছবিগুলো দেখলেই আপনি আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হাল-হকিকত বুঝতে পারবেন ।

তাহলে কী হচ্ছে? বর্জ্যের বিষাক্ত সব দূষিত পদার্থগুলো চুইয়ে চুইয়ে নদী, খাল, বিলের পানিতে, ভূমিতে, মিশে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ তো ধ্বংস করছেই, এছাড়াও বর্জ্যগুলো খোলা অবস্থায় থাকার ফলে এর বিষাক্ত পদার্থগুলো বিভিন্নভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে আমাদের অসুস্থ করে তুলছে ।

পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা জানি যে বর্জ্য থেকে অ্যানারোবিক কিংবা কম্পোস্ট প্রক্রিয়ায় সার ও গ্যাস উৎপাদন করতে গেলে যে মিথেন গ্যাস উৎপাদিত হয় তা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এক হুমকি সৃষ্টি করে কারণ তা কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে ৩৪ গুণ বেশি শক্তিশালী। এছাড়াও ল্যান্ডফিল কিংবা

অ্যানারোবিক পদ্ধতিতে পৌর বর্জ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা করতে গেলে প্রচুর ভূমির প্রয়োজন হয় যা জমির ওপর চাপ ফেলে। যা ইতোমধ্যেই আমাদের জন্য একটি সংকট সৃষ্টি করেছে। ইত্যাদি নানা রকম সংকট ও বিপর্যেয়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে নন-থার্মাল তথা ল্যান্ডফিলিং বা অ্যানারোবিক ডাইজেস্ট নয়, থার্মাল তথা ইনসিনারেশন কিংবা গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং দীর্ঘমেয়াদি বিবেচনায় সাশ্রয়ী। আমরা যদি নন-থার্মাল ল্যান্ডফিল্ড ও থার্মাল পদ্ধতির ইনসিনারেশনের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদনে তুলে ধরি তাহলে দেখব যে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যে সব অসুবিধা হতে পারে সেগুলো হল :

(১) প্রচুর ভূমির প্রয়োজন ।
(২) ভূমির দাম বিবেচনায় এটি ব্যয়বহুল ।
(৩) দৈনিক প্রচুর পরিমাণ লিচেট বা দূষিত জলস্রোত নদী-খাল-বিল, ভূতলে পানি স্তরে, ভূমিতে প্রবাহিত হয়।
(৪) এ লিচেট অপসারণ করা যেমনি ব্যয়বহুল তেমনি কষ্টসাধ্য।
(৫) ভূমিতে ফেলে দেয়া বর্জ্য থেকে সর্বদাই দুর্গন্ধ নিঃসরিত হয়।
(৬) বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাস, যা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী, তা নিঃসরিত হয়।
(৭) ভূপৃষ্ঠ এবং ভূতলের পানি এ বর্জ্য থেকে নিঃস্বরিত দূষিত লিচেট থেকে দূষিত হয়ে ওঠে।
(৮) বর্জ্য ডিপোতে জমাকৃত পেট্রোলিয়াম বা নানারকম দাহ্য পদার্থের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে অগ্নিকা- হতে পারে।
(৯) ভূমি ভরাটের স্থান থেকে চারদিকে ন্যূনতম ১ কি.মি. দূরত্বের বসবাসের স্থান করতে হবে।

অপরপক্ষে আমরা ইনসিনারেশন/গ্যাসফিকেশন পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো একটু দেখি:

(১)এ পদ্ধতির জন্য অনেক কম জায়গা লাগে। একই পরিমাণ বর্জ্যের জন্য ল্যান্ডফিল্ডে যে পরিমাণ জায়গা লাগে তার থেকে অন্তত ১৫ গুণ কম জায়গা এ পদ্ধতিতে প্রয়োজন পড়ে।

(২) কোন দূষিত লিচেট যা চুইয়ে চুইয়ে ভূমিতে, পানিতে মিশে পরিবেশ দূষিত করে তা নির্গত হবে না।

(৩) বিশ্ব উষ্ণতা সৃষ্টিকারী কোনো মিথেন গ্যাস কিংবা দূষণযুক্ত গ্যাস উদগীরণ করে না।

(৪) ভূ-তলের পানির স্তর দূষিত করে না।

(৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন বিধায় জাতীয় গ্রিডে এটা একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে ।

(৬) তাৎক্ষণিকভাবে বর্জ্য নিঃশেষিত হয়ে যায়।

(৭) এটা উন্নত বিশ্বে পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বে পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে নিউজিল্যান্ড একটি অগ্রসর দেশ। নিউজিল্যান্ড পৌর বর্জ্য ব্যবহার কোন কৌশলে এগোবে নিজেদের জন্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের জন্য বর্জ্য ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতির মান নির্ধারণে একটি সূচক প্রণয়ন করেছে , যা নিচে টেবিল-৩ এ দেয়া হল। উল্লেখ্য যে মানের সর্বোচ্চ মান ৩ ও সর্বনিম্ন মান 'শূন্য' ধরা হয়েছে। এ মানের ওপর ভিত্তি করে আমরা দেখছি ইনসিনারেশন পদ্ধতিটি অন্যান্য পদ্ধতির থেকে সর্বোচ্চ মার্ক পেয়ে শীর্ষে আছে ।

টেবিল-৩ : বিভিন্ন পদ্ধতির র‍্যাকিং নির্ধারণ

ক্রঃ	বিষয়	ইনসিনারেশন	অ্যানারোবিক ডাইজেশন	গ্যাসিফিকেশন	পাইরোলাইসিস
১.	বায়ু দূষণ	০	৩	১	২
২.	ব্যয়	২	৩	০.৫	০.৫
৩.	পার্শ্ব উৎপাদন	১.৫	১.৫	০	৩
৪.	ক্ষমতা	৩	২	১	০
৫.	পরিপক্বতা	৩	২	০.৫	০.৫
৬.	জ্বালানি দক্ষতা	১.৫	০	৩	১.৫
৭.	বর্জ্যের ধরন	২	০	২	২
	মোট	১৩	১১.৫	৮	৯.৫

আমরা সমস্ত প্রতিবেদনটি পড়ে ও বাংলাদেশের বর্তমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হাল-হকিকত দেখে এবং নিউজিল্যান্ড কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন পদ্ধতির সূচকের মান নির্ধারণের ফলাফল দেখে নিশ্চিত যে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য ইনসিনারেশনই সর্বোত্তম পদ্ধতি। এ বিষয়ে পাঠকদের একটা সুখবরের বার্তা দিতে পারি। নিচের ছক-৪ এ যে ৩টি জেলা এবং ৪টি উপজেলা রয়েছে এ পৌরসভার সম্মানিত মেয়রদের সাথে আমার আজ দুবছর ধরে আলাপ হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের পৌরসভার বর্জ্যগুলো একত্রিত করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করতে
চাচ্ছেন। ছকে আপনারা দেখবেন যে সবাইর একত্রিত দৈনিক বর্জ্য সংগ্রহ মাত্র ৬২ টন। মেয়র সাহেবরা জানালেন যে আসলে এটা বিনে জমাকৃত বর্জ্যের মাত্র ৪০%। বাকিটা সংগ্রহ হচ্ছে না। কম প্রাপ্তির তালিকাটাই আমি পেয়েছি। কাজেই প্রকল্প হলে এ বর্জ্যের পরিমাণ হবে ন্যূনতম ১০০ টন/ দৈনিক। ছকে আর একটি জিনিস খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে ঝিনাইদহ জেলায় মোটমুটিভাবে সবগুলো এলাকার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। আবার ঝিনাইদহ পৌরসভার বাড়তি জায়গাও আছে। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় ঝিনাইদহকে কেন্দ্র করে একটা চমৎকার ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। এটা মেয়র সাহেবদেরই প্রস্তাব। আমাদের অর্থ জোগানের পদক্ষেপও ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। এটাও ইতিবাচক।

আমরা আশা করছি ঝিনাইদহে বাংলাদেশের প্রথম ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট সফলভাবে শিগগিরই স্থাপন করতে পারব ।

টেবিল-৪: বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি জেলা/উপজেলার বর্জ্য উৎপাদনের ধরণ ও পরিমাণ

ক্র:	পৌরসভার নাম	পৌর জনসংখ্যা	বর্জ্য টন/ দৈনিক	বর্জ্য টন/ বার্ষিক	বিদ্যুৎ চাহিদা মে.ও.	ঝিনাইদহ থেকে দূরত্ব [কি. মিটার]
১.	ঝিনাইদহ	২,০৫,৪২৩	২০	৭৩০০	৪.৯	০
২.	চুয়াডাঙ্গা	১,৭৮,০১০	১৫	৫৪৭৫	৪.০	২৮
৩.	মাগুরা	১,২৩,০২৩	১৫	৫৪৭৫	৪.০	২৮
৪.	কোটচাঁদপুর	৫৬,০০০	৪	১৪৬০	১.০	৩০
৫.	মহেশপুর	৩৪,০০০	২	৭৩০	১.০	৩৫
৬.	কালীগঞ্জ	৪৭,০০০	৩	১০৯৫	১.০	১৫
৭.	শৈলকূপা	৪২,০০০	৩	১০৯৫	১.০	২০
	মোট	৬,৮৫,৪৫৬	৬২/ দৈনিক	২২,৬৩০ /বার্ষিক	১৬.৯	

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মো. আ ফ সা র আ লী

'বর্জ্য' শব্দটা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে, বাংলাভাষায় এর অর্থ– বর্জনযোগ্য বা বর্জনীয়। পদবিচারে তা বিশেষণ। মানবদেহ থেকে নির্গত মলমূত্রের মতো আমাদের সভ্যতার দেহ থেকে নির্গত বা সভ্যতার উপজাত (By product) দ্রব্য বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত। হালে বর্জ্য হিসেবে যা দেখা যাচ্ছে বা সামনে আনা হচ্ছে তা একসময় বর্জ্য বা বর্জ্যনীয় ছিল না। আম-কাঁঠালের আঁঠি, খোসা, তরকারির এঁটো, মাছের কাঁটাকে নিকট অতীতে আবর্জনা পদবিচারে গণ্য করা যেত। এর সাথে বর্জ্যের তকমা আঁটার প্রয়োজন পড়েনি। সংগত কারণেই তাই আলোচনাটা একটু পেছন থেকেই শুরু করছি।

আমাদের এই ভূভাগটা গাঙ্গেয় বদ্বীপ, পলি জমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এখানকার ভূ-ভাগের দক্ষিণাংশের ভূমিগঠন এখনও চলমান। "অসংখ্য দ্বীপমালা নিয়ে গঠিত আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির ভূমি গঠনের সাথে যুক্ত দ্বীপমালাকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখান হয়েছে– মৃত বদ্বীপ, পরিণত বদ্বীপ ও দক্ষিণভাগে জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ অপরিণত বদ্বীপ" (১)। দক্ষিণ ভাগের ভূমি গঠন এখনও শেষ হয়নি তা চলমান। অর্থাৎ এই অংশটা এখনও অপরিণত। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বলছে "বঙ্গ" শুধু প্রাচীনই নয় এর সাথে মিশে আছে নানা ঐতিহাসিকতা। বৈদিক যুগে দীর্ঘতমার ঔরসজাত পুত্রগণের মধ্যে এক পুত্রের নাম 'বঙ্গ'। সেই সূত্রে আমাদের বাংলাদেশ ওই বঙ্গেরই অঙ্গ। আদি মহাভারতীয় যুগে নানা ঐতিহাসিকতার মধ্যে আছে এর রাষ্ট্রব্যবস্থা। পাল, সেন, পাঠান, মোঘল, ইংরেজ যুগ পার করে '৪৭-এ আমরা পাকিস্তানের অংশ হলাম। '৭১-এ সেই বন্ধন ছিন্ন করে আমরা এখন স্বাধীন স্বদেশের রসসুধার মধ্যে আছি। মূল বা আদি বাংলার পূর্ব ভাগ এখন স্বাধীন ভূখণ্ড। আমরা আমাদের আলোচ্য "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" বিষয়টির ওপর আলোচনা আমাদের অংশেই সীমাবদ্ধ রাখব।

সমুদ্র-মেখলা বড়-ছোট, নদ-নদী, খাল বিল, হাওড়-বাওড়, খানা-খন্দের জালে জড়ানো আমাদের এই ভূ-ভাগের মানুষের সেকালের যোগাযোগ বা যাতায়াতের বাহন ছিল নৌকো, গরুর গাড়ি, ও মহিষের গাড়ি। একটু দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ি সময়ের দাবিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল। ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকালে সেখানে দেখেছি অনেক ঘোড়ার গাড়ি। যাত্রীবহন শুধু নয় দূরবর্তী নাটোরে ঘোড়ার গাড়িতে মালামাল আনা নেয়া হত। আমাদের ঘর-দোর, গরু-ছাগল, হাঁসমুরগি, চাসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবই আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, আপন মহিমায় মহিমান্বিত। মাটিঘনিস্ট সেকালের ঘরবাড়ি নির্মাণে অভিন্ন রীতি পরিলক্ষিত হত। গৃহ রচনায় এখানকার প্রচলিত প্রবাদ: "উত্তরে বাগ, দক্ষিণে ফাঁক/পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ"। (২) আমাদের মুল ভূ-ভাগের দক্ষিণে সমুদ্রের সাথে আমাদের গৃহ পরিকল্পনায় ফাঁকের রহস্যটা মিলে যাবে। বাড়িতে উত্তরে বাগানের সংস্থান, এর পাশে পশ্চিমে থাকছে বাঁশঝাড়। বাগ-বাগিচা এবং বাঁশ মিলে ঈশান কোণের ঝড়ের আক্রমণ প্রতিহত হত প্রাকৃতিকভাবে। অর্থাৎ প্রকৃতিই রক্ষা করত তার সন্তানদেরকে।

বাড়ির পূর্বভাগে থাকবে পুকুর, সেখানে খেলা করবে হাঁস । মাটিঘনিস্ট এই মানুষগুলো যে গৃহে বাস করবে তাকেও ঘিরে রেখেছে প্রবাদ। এ প্রসঙ্গে খনা বলছেন 'দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা/ উত্তর দ্বারী তার প্রজা পূর্ব দ্বারীর মুখে ছাই' পশ্চিম দ্বারীর খাজনা নাই। (৩) এখানেও ঘরের দরজা দক্ষিণ পাশে। আজকের নগরবিদ পুরাকৌশলের শিক্ষার্থীরা ঘরের নকশা প্রণয়নে ঘরের দক্ষিণে দরজা স্থাপনের গুরুত্বই বেশি দিয়ে থাকেন।

হালে পুরকৌশলীদের হাতে ঘর-বাড়ি একত্রে রচিত হচ্ছে আগে এমনটা ছিল না। ঘর বলতে তখন নির্দিষ্ট কোনো গৃহকে বুঝানো হত। বাড়ি ছিল পরিকল্পিতভাবে সাজানো বিশেষ প্রয়োজনে নির্মিত কয়েকটা ঘরের সমষ্টি, সাথে থাকত পুকুর ও বাগান। এমন ব্যবস্থায় থাকত বাড়ি সংলগ্ন ধানের গোলা, ঢেঁকিঘর, রান্নাঘর, দহলিজ ঘর। কাছাকাছি থাকত হাঁস-মুরগির আবাসস্থল– ছোট কুঠুরি। থাকত বাড়ির অদূরে গোয়াল। গোয়ালের পাশেই গোখাদ্য খড়-বিচালির গাদা। গোয়ালের সাথেই গোবরের গাদা। বাড়ির উঠানের কাছাকাছি আবর্জনার রাখার গর্ত, ছাই, তরি-তরকারির কুটনি, এঁটোকাঁটা ফেলার ছোট গর্ত। গোবর আপন ইচ্ছায় কিংবা গতিতে গাদায় পড়ে জৈব সারে পরিণত হত। বাড়ির পাশের আবর্জনাও একই ধারায় সারে রূপান্তরিত হত। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ঐ সার তুলে চাষের জমিতে ফেলা হত। আবর্জনাও একই ভাবে চাষের জমিতে স্থান পেত। এ সবই চাষের জমির উর্বরতা বাড়াত। একই কাজ বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার করা হত। মলমূত্র ত্যাগের কাজটা বাগানেই হত। মাটি আপন গরজে তা খেয়ে ফেলত। গ্রাম গাঁয়ের গৃহস্থবাড়িতে কাঁচা কিংবা পাকা পায়খানা থাকলেও তার ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। বদনা নামের একটা পাত্র বাড়ির বারান্দায় থাকত। পুকুর থেকে বদনায় পানি নিয়ে বাগানে গেলে বুঝতে পারত সকলে, কাজটা কী হতে যাচ্ছে।

গ্রামের ছোট বড় হাটবাজার, ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর অবস্থান নদীর কিংবা বড় কোনো জলাশয়ের ধারে। ঝুড়ি, ডালা, ধামা এমনসব পাত্র, প্রয়োজনে চটের বস্তায় মালামাল হাটেবাজারে নেয়া হত। হাটবাজার শেষ হলেই সকল জিনিস পত্র বাড়িতে চলে যেত, কিংবা বসতি কোনো দোকানে রাখা হত। হাটের যত আবর্জনা তা-ও মাটিতে মিশে যেত আপন গতিতে। হাটেবাজারে কোনো পৃথক টয়লেটের প্রয়োজন হত না। একইভাবে আমাদের শহরগুলো গড়ে উঠেছে নদীর ধারে। একটু উন্নত জীবনযাত্রা শহরের মানুষের। দালানকোঠায় বাস করে থাকে শহরের মানুষ। এখানেও সেকালে সেপটিক ট্যাংকের ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। একটু উঁচু করে পাকা পায়খানাঘর তৈরি করে তার নিচে রাখা হত মাটির বড় পাত্র। মলমূত্র ঐ পাত্রেই পড়ত, সকালে মেথর এসে তা নিয়ে যেত দূরে কোথাও। নদীর বরাবর বাঁশের কিংবা কাঠের মাচা করে সেখানে থাকা, খাওয়া, গোসল সহ সব ব্যবস্থা ছিল শহরে। সময়ের সিঁড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির উদ্ভব হয়েছে। বর্জ্য বলতে যা তা অপসারণের দায়িত্ব তারা পালন করেছেন। হাটবাজার, শহরের সকল বর্জ্যই মাটিতে মিশে কিংবা পানিতে ফেলে দূরে কোথাও চলে গেছে।

"পানিদূষণ" কিংবা "পানির অপচয়" এসব শব্দের সাথে সেদিনের লোকজনের কোনো পরিচয়ই ছিল না। বাড়ির সাথে থাকত পুকুর, আবার এজমালি কোনো পুকুর বা জলাশয়ের পাশে থাকত মসজিদ কিংবা মন্দির। পুকুরে গোসল, অজু , থালাবাসন ধোয়া, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা সবই কাজই চলত। গরুর গোসলের প্রয়োজন হলে তা-ও পুকুরে সমাধা হত। পাকা ঘাট নেই তাতে কী? যে যার প্রয়োজনে কাঠের গুড়ি ফেলে ঘাট তৈরি করে নিয়েছে। শহরেও বড় বড় শানবাঁধানো ঘাটসমৃদ্ধ পুকুর। মানুষ সেখানে গোসল করত সাঁতার কাটত। ঐসব ধোয়ানি বা ময়লা কিন্তু পুকুরের পানি আপন শক্তিতে হজম করে স্বচ্ছ রাখত। গ্রামের এঁদো খানাখন্দে পাট পচানো হত। পাটপঁচা পানি একেবারে কালো রং ধারণ করত।

অল্পদিন পরেই দেখা যেত, সেখানে কাচের মতো স্বচ্ছ পানি যেন ঝলমল করছে। মাটি কিংবা পানির পরিশ্রুতকরণ ক্ষমতার ওপর একটু-আধটু চাপ যে আসত না তা নয়। বদ্ধ পানি দীর্ঘকাল আবর্জনা ধারণ করে হাঁপিয়ে উঠলে বন্যা এসে তা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিত। মাটি ও পানি এই বর্জ্য শোষণ করে মাটি কিংবা পানিতে ধারণ করার বা আত্মস্থ করার নিজস্ব যে ক্ষমতা তাকে বলা হয় মাটি কিংবা পানির বাস্তুসংস্থান ক্রিয়া ইংরেজি পরিভাষায় যার নাম উপড় System। মাটি কিংবা পানির সকল উপাদানের নিজস্ব এবং পারস্পরিক ক্রিয়া যেটাকে বলা হয় System যা মূলত পরস্পরের প্রতিসাম্য বা Due proportion। ইংরেজিতে এই System বা নিয়মবদ্ধ রীতি বা পদ্ধতি এখন প্রতিসাম্য নষ্ট করে ব্যবস্থাপনা বা Management-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবর্জনাগুলো ক্রমে বর্জ্য নামে পরিচিতি পেয়েছে। সেই বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা নিয়ে এখন আমাদের ভাবনা।

দুই.

১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' আমাদের বাংলাদেশ। এখন জনবহুল দেশ হিসেবে পৃথিবীর নবম, জনঘনত্বের দিক থেকে দ্বাদশ (কেউ কেউ বলেছেন দশম) স্থানে অবস্থান করছে। ২০১৯ সাল অর্থাৎ বর্তমানে এর জনসংখ্যা ১৬ কোটি ১৪ লাখ। গ্রাম-গাঁয়ের মানুষ আমরা, আমাদের আবর্জনা তখনও বর্জ্যের তকমা পায়নি। ১৯৭৫ সাল সেসময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১৪ লাখ। বর্তমান অর্থনীতিক মর্যাদায় আমরা বিশ্বে স্বল্পউন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত। আমাদের মাথাপ্রতি বার্ষিক আয় ১৭৫১ ইউএস ডলার। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে এর জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে সরাসরি যুক্ত। গত দুই দশকে আমাদের অর্থনীতিক উন্নয়নের গতিও বেশ ভালো। রফতানি আয়ের দিকটা কিন্তু ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। শতকরা ৮১ ভাগ রফতানি আয় আমাদের তৈরি পোশাক এবং বস্ত্রখাত থেকে আসছে। এরপরও আমাদের উন্নয়ন কর্মকা- কিন্তু থেমে নেই। আমাদের বিদ্যমান কৃষি অর্থনীতি এবং এর সাথে যুক্ত কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যে পারিবারিক প্রয়োজনীতার গণ্ডি পেরিয়ে তা বাণিজ্যিক মর্যাদা নিয়েছে। ধান, পাট, রবিশস্য একই সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চিংড়িচাষ দেশের অর্থনীতিতে পুষ্টি প্রদান করলেও বর্জ্যের ক্ষেত্রেও তা কিন্তু পুষ্টিতে থাকছে না। মাটিও পানি তার উৎপাদন ও পানি পরিশ্রুতকরণ ক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ইতোমধ্যে শহর-নগরের মাটি এবং পানি তার উপড় System ভেঙে ফেলতে বসেছে।

১৯৭৫ থেকে ২০১৯ এই সময়কালে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ কোটি। বর্ধিত এই জনসংখ্যার চাপ সহ্য করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়েছে, জিডিপি ও বেড়েছে। ১৯৯৬ সালের Bangladesh Economic Review : - Macro Economic Indication শীর্ষক একটা নিবন্ধে প্রকাশিত সারণিতে দেখানো হয়েছে '২০১১-১২ অর্থবছরে থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমানুসারে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐ তথ্য সারণিতে ২০১১-১২ অর্থবছরে G. D. P Growth দেখান হয়েছে '৬.৫২'। (৪) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ঐ হার বেড়ে দাড়িয়েছে ৭.০৫। একই সারণিতে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাণিজ্যঘাটতি দেখানো হয়েছে ৭৩৭.২ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা ৩০৫.১ বিলিয়ন ডলার। ঐ সময়কালে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ২০১১-১২ সালে যা ছিল ৮.৬৯, ২০১৫-১৬-তে কমে দাঁড়িয়েছে ৬.০১। এ তথ্য আমাদের অর্থনীতির উন্নয়নের চিত্র ধারণ করে। রপ্তানিবাণিজ্যে আমাদের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের উন্নতির কথা আগেই বলেছি। ঐ শিল্প থেকে উৎসারিত বর্জ্যের দ্বারা যে

ক্ষতি হচ্ছে তার পরিসংখ্যান আমাদের হাতের কাছে নেই। তথ্য না পেলেও চোখের সামনে যে চিত্র ভাসছে তা রফতানি আয়ের সাথে মেলালে লোকসানের ভয়াবহ চিত্রই উঠে আসবে।

আমাদের পোশাকশিল্প ও বস্ত্রখাতে কৃত্রিমতন্তু বা সুতোর ক্ষেত্রে ব্যাপক বিবর্তন ঘটেছে। আগের দিনের তুলোর আঁশ থেকে সংগৃহীত সুতোর সাথে কৃত্রিমতন্তু হিসেবে সিনথেটিক সুতোর মিশ্রণে সুতিবস্ত্র নামে যা আমরা ব্যবহার করছি, এখন সেটা সুতোর সাথে পলিমারের মিশ্রণে সুতো আর সুতো নেই। তার স্থায়িত্ব বেড়েছে বটে, কিন্তু ঐ সুতোর বস্ত্র আমরা যা বাদ দিচ্ছি তা মাটি গ্রহণ করছে না। এটাও এখন বর্জ্যের রূপলাভ করে সংকট সৃষ্টি করছে। এই খাতের ত্যক্ত বর্জ্য যা রাজধানীর সাভার-আশুলিয়া থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম-গাঁয়ের দর্জি দোকানের ত্যক্ত কাপড়ের টুকরো, এর সাথে ১৬ কোটি ১৪ লাখ লোকের বাদ দেয়া কাপড়-চোপড় দৈনিক কী পরিমাণে আমাদের মাটিতে পড়ছে তার কোনো পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই। বিদ্যমান বাস্তবতায় বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের রফতানি আয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলার যৌক্তিক কারণ আছে বলে মনে করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

১৯৭৫ থেকে ২০১৯ এই সময়কালের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এই দীর্ঘ সময়কালকে দু'টো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা দরকার। প্রথমভাগে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের সময়কাল থেকে ২০০০ সাল অবধি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকা- দেখা যাবে, সদ্যস্বাধীন এই দেশটাকে দিশাহীন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের উত্থান-পতনের নির্মম নিষ্ঠুর খেলা। এইসব চক্রান্তকে পায়ে ঠেলে '৭৫ থেকে '৯০ এই সময়কালে সামরিক শাসনের আড়ালে গণতান্ত্রিক আবহ সৃষ্টির নির্লজ্জ প্রয়াস। বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর নিরলস সংগ্রাম এবং এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মূল চেতনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইস্পাতকঠিন শপথের অনুশীলন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বেড়াজালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সদ্যস্বাধীন দেশটাকে দিশাহীন, আদর্শচ্যুত করে সেখানে নতুন ধাঁচের উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার নীলনকশার প্রতিটি পরতে রয়েছে রক্ত। ৭৫ থেকে ৯০ দীর্ঘ সময়ে সামরিক লেবাসে গণতন্ত্রের নামে ঔপনিবেশিক শাসনের নতুন ধারার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে জনগণের জয় না হলে আমাদের সাধের স্বাধীনতাই ইতিহাসের বর্জ্যের তকমা পেত।

দ্বিতীয় ভাগে '৯০-পরবর্তী গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বর্জ্যের ভয়াবহ রূপ চোখে পড়বে। ঔপনিবেশিক ধারার সেনাশাসন থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক ধারার শাসনব্যবস্থার খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী দশকগুলোতে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উন্নয়নের পথে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। গত একদশক যাবত দেশের অগ্রযাত্রায় ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে। আমাদের অর্থনীতির সূচকগুলোর দিকে চোখ বুলালে তা বুঝতে কারুর কষ্ট হবার কথা নয়। আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্রাম-গাঁয়ের আবাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ঘরবাড়ি নির্মাণের সনাতন ধারার স্থলে নির্মাণসামগ্রীর পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম-গাঁয়ে নতুন নতুন দালানকোঠা গড়ে উঠেছে। পাশে গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাটবাজার, ক্লিনিক এমন সব প্রতিষ্ঠান। শহরের জীবনব্যবস্থার দিকে দ্রুত গ্রাম্যজীবন ব্যবস্থা ধাবিত হচ্ছে। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। সুদূর পল্লিগ্রামের কোনো কোনো বসতঘরে এখন এসি চোখে পড়ে। গ্রামের নতুন নতুন গৃহ নির্মাণ হচ্ছে কিন্তু, তা হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। ব্যক্তিমালিকানায়, ব্যক্তিব্যবস্থাপনায়, ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ও অর্থায়নে

বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। গ্রাম্য কোনো বড়-ছোট জলাশয়ে সর্বসাধারণের মিলিত ব্যবহার এখন আর চোখে পড়ে না। ষাটের দশকে সুপেয় পানির সন্ধানে পুকুরের স্থলে অগভীর নলকূপ স্থাপনের সময় নলকূপের অতিরিক্ত পানি পুকুরে, খানাখন্দে ফেলা হত। নলকূপের নির্গত পানি পুকুরের পানিকে দূষিত করে এক সময় পুরো পুকুরকেই দূষিত করে ফেলত। কেন এমনটা হত? জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর তা আজও জানে না।

ব্যক্তিপর্যায়ে অপরিকল্পিত বাড়ি নির্মাণ, নলকূপস্থাপন, বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে নির্গত পানি ও বাড়ির বর্জ্য একত্রিত হয়ে বাড়ির পরিবেশ শুধু নয়, এলাকার পরিবেশকে দূষিত করছে। অপরিকল্পিত এই স্থাপনার ফলে এলাকার পানি নিষ্কাশনের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হচ্ছে। এর পাশাপাশি নলকূপ স্থাপন করে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে কৃষিতে ব্যাপক সেচকার্য পরিচালিত হওয়ায় ভূগর্ভস্থ শুপেয় পানির অভাব হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ শুপে পানির শূন্যস্থান পূরণ করছে পাশের লোনা পানি। এর ফলে পুরো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সাথে মৎস্যচাষের জন্য সৃষ্ঠ ঘেরের লোনা পানি তৎপার্শ্বস্থ বাড়িঘরের পানি মিশে জটিল এক অবস্থার সৃষ্টি করছে যা একই সাথে মাটি ও পানির উপরের system-কে ধ্বংস করছে। যে পানি আমাদের শরীর, আমাদের মাটি, বলতে গেলে আমাদের পুরো ধরণী পরিচ্ছন্ন রাখবে সেই পানিই যখন বর্জ্যের রূপলাভ করে, তখন আর কোনো উপায় থাকে না। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর তখন চাপ স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠা মৎস্যঘেরের পানি কাঁচা গোবর, মাছের খাদ্য এসবের সাথে মিশে বর্জ্যের মর্যাদা নিয়ে নদীতে পড়ছে, বাড়ছে নদীদূষণ। এর সাথে শিল্পকারখানার নির্গত বর্জ্যপানি গৃহস্থালির বর্জ্যপানি একত্রিত হয়ে ক্রমে পানি যার 'এক নাম জীবন' তা উল্টো পথে হাঁটছে।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় গড়ে উঠছে শহর। বড় বড় শহর যেমন– ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর, এমনসব শহরগুলো এখন মেগা সিটির রূপলাভ করেছে। শহরায়ন বা নগরায়ন যাই বলি-না কেন, তা গড়ে উঠছে কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে। অপরিকল্পিত শহর কিংবা নগরে পরিকল্পিত কোনো ব্যবস্থাপনার ধারণা শুধু ধারণাই। বাস্তবতার সাথে তার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। শহর কিংবা নগরবাসীর অপরিকল্পিত আবাসনের সাথে সেখানকার অধিবাসীর জীবনব্যবস্থার তাগিদে গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার। তৈরি হচ্ছে রাস্তাঘাট। একই সাথে পানি কিংবা পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য তৈরি হচ্ছে ড্রেনেজ ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক জীবনধারাকে সজীব রাখতে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা। শহরের অদূরে তৈরি হচ্ছে ইটভাটা, সিরামিক শিল্পকারখানা, সার-কীটনাশকের কারখানা, লেদ শিল্পকারখানা, বড় বড় বহুতল ভবনে গড়ে উঠেছে পোশাকতৈরির কারখানা। মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে হোটেল-রেস্তোরাঁ, ছোট-বড় দোকানপাট। শহর কিংবা নগরের নাগরিক সুবিধা দেখভালের জন্য গঠিত হয়েছে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন। পৌর এলাকা সৃষ্টি এবং নতুন নতুন পৌরসভা গঠন এখন উপজেলা পর্যায়ে পৌছে গেছে। পৌরসভা কিংবা সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্র ক্রমেই বাড়ছে। সেখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সীমিত জনবল, গাড়ি-ঘোড়া, যন্ত্রপাতি নিয়ে শহর কিংবা নগরের বর্জ্য অপসারণে কাজ করছেন। নিকটবর্তী কোনো স্থানে বর্জ্যাধার তৈরি করে সেখানে বর্জ্য ফেলছেন। বর্জ্যাধারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

তিন.

দেশের বড় বড় শহর, বন্দর , হাটবাজার, গৃহস্থালি, রাস্তা, গাড়িঘোড়া, দোকানপাট, হাসপাতাল, হোটেল-রেস্তোরাঁ ইত্যাদি উৎসে আমরা বর্জ্য হিসেবে যা ফেলছি তার হিসাবটা দেখা দরকার । বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত বর্জ্যের ক্ষতি করার ক্ষমতা, আকার, প্রকৃতি ইত্যাদি সব বিবেচনায় বর্জ্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে গেলে আমাদের সামনে প্রথমেই আসবে খাদ্যবর্জ্য, তারপর এক এক করে কৃষিবর্জ্য, বর্জ্যপানি, সবুজবর্জ্য, তাপবর্জ্য, শিল্পবর্জ্য হাঁস-মুরগির মল, নর্দমার আবর্জনা । এরপর আসবে নির্মাণশিল্পজাত বর্জ্য, ভবন ভেঙে ফেলার ফলে উৎসারিত বর্জ্য, খনিবর্জ্য, চিকিৎসাখাতের ওষুধশিল্পের জৈব (Organic) বর্জ্য, মোড়ক শিল্প বর্জ্য, জাহাজভাঙা, এমন সব ঘনজৈব বর্জ্যের সাথে যোগ হয়েছে ইলেকট্রনিক বর্জ্য । চিকিৎসাখাতের (Organic) জৈব বর্জ্যের সাথে থাকছে রাসায়নিক বর্জ্য । এছাড়া তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, বাচ্চাদের খেলনা । তার সাথে হালে যুক্ত হয়েছে ইলেকট্রনিক বর্জ্য । এটাই ই-বর্জ্য । বর্জ্যের বিন্যস্ত এইসব শ্রেণির ওপর পৃথকভাবে আলোচনার সুযোগ এখানে কম । তাছাড়া এইসব শ্রেণির বর্জ্যের পরিমাণ নির্ধারণও এখন অসম্ভব । এই পরিসরে আমাদের শিল্পখাতে পুনঃব্যবহার্য (Recycling) পণ্য, যা আবার পণ্য হিসেবে জনপ্রিয়, শিল্প হিসেবে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অধিক এমন কিছু পণ্যের উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব ।

এই পরিসরে প্রথমেই প্লাস্টিক শিল্পের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব । বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতিতে এই শিল্পের গুরুত্বও অনেক । 'বাংলাদেশে তিন হাজারের মতো ছোট-বড় প্লাস্টিক কারখানা আছে [৫] । এর মধ্যে ১৯৬৮ টা ছোট, ৯৮০টা মাঝারি এবং ৫২ টা বড় কারখানা আছে (৫) । উৎপাদনশীল এই খাত থেকে সরকার বছরে দু'হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব পায় । ১.২ মিলিয়ন মানুষ এই শিল্পে কাজ করে । উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রফতানি করে বছরে কমপক্ষে চারশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে । ক্রম এবং দ্রুত বর্ধনশীল এই শিল্প রিসাইক্লিং বা পুনঃব্যবহার উপযোগী কাজে ব্যাপৃত । এখানে পুনঃআবর্তন বা পুনঃব্যবহার উপযোগী বলতে কোনো বর্জ্যকে সম্পদে পুনঃরূপান্তর বুঝানো হয়ে থাকে । প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে এই পুনঃরূপান্তর ক্রিয়া ক্রমে ব্যাপকতর হচ্ছে । ১৯৬০ সালে যে প্লাস্টিক বাচ্চাদের খেলনা, পাটকলে ব্যবহৃত ছোট ছোট যন্ত্রাংশ হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হত, হালে তা মহীরুহের রূপ নিয়েছে । অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্লাস্টিক দ্রব্য ছাড়া এখন আমাদের চলছেই না । সাধারণ, অসাধারণ সকল ক্ষেত্রেই এর কদর । দেশে শুধু নয় প্লাস্টিক সামগ্রীর কদর এখন বিশ্বব্যাপী । সে কারণ এই শিল্প ক্রমেই প্রসার লাভ করছে । তবে এই শিল্পের বৃদ্ধি বা প্রসার কিন্তু সারাদেশের ৬৪টি জেলায় সমানভাবে হচ্ছে না । এটা ব্যাপক আকারে হচ্ছে ঢাকায়, এর পর চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং এসব সিটি-সন্নিহিত এলাকায় ।

প্লাস্টিক একটা সংশ্লেষিত (Synthetic) ও আধাসংশ্লেষিত (Semi Synthetic) দ্রব্য । এটা মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন ও সালফারের মতো উপাদানের সমষ্টি । কাঁচামাল হিসেবে সেলুলোজ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, লবণ, ও অশোধিত তেল প্লাস্টিক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় । শিল্পপ্লাস্টিক তৈরি হয় পেট্রোকেমিকেল থেকে । প্লাস্টিকের আনবিক ভর একটু বেশি । যার অর্থ হল প্লাস্টিক দ্রব্যে এমন কিছু পলিমার আছে যাতে, থাকে হাজার হাজার অনুবন্ধণী বা Atomic Bond । এদিকে কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে প্লাস্টিক দামে খুব সস্তা, ওজনে হালকা, আবার অধিক স্থায়ী একটা দ্রব্য । এটা সহজে অন্য দ্রব্যে বা রূপে রূপান্তর করা যায় । প্লাস্টিকে তাপে দ্রবীভূত করে, ছাচে ফেলে অথবা চাপে এই রূপান্তর ঘটানো হয় । এভাবে পলিথিন, প্লেট, বোতল, টিউব কিংবা ছোট বড়

পাইপ ইত্যাদি তৈরি হয়। প্লাস্টিকের তৈরী এসকল সামগ্রী বস্তুত সবই প্লাস্টিকের পলিমার। আমাদের ঘরে ঘরে ব্যবহার্য চেয়ার টেবিল, আলনা, সোফা, জগ, বালতি, গ্লাস, বদনা, সুতা, জুতা, খেলনা সবই রূপান্তরিত প্লাস্টিক। এগুলো সবই হাজার হাজার অনুবন্ধণী সমৃদ্ধ পলিমার।

প্লাস্টিকের এই পলিমার দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত থার্মোসেট যা একটার সাথে অন্যটার মিশ্রণ। যেমন সুতোর পলিমারের কাপড়ের উপর প্রলেপ দিয়ে রেক্সিনের মতো ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন। এই থার্মোসেট জাতীয় পলিমার পুনঃব্যবহারের জন্য রিসাইক্লিং করা যায় না। দ্বিতীয়টি হল থার্মোপ্লাস্টিক যাকে সহজেই পুনঃরূপ দেয়া যায়। এগুলো শক্ত। অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যও এর ক্ষতি করে না। যেমন ঐউচউ, LDPE, PVC পলিপ্রোফিলিন পলিষ্ট্রিন ইত্যাদি। এই দুই শ্রেণির পলিমারের প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ রেক্সিন যা পুনঃসাইক্লিং করা যায় না। তা অচিরেই বর্জ্যের খাতায় পড়ে যায়। ফলে অচিরেই থার্মোপ্লাস্টিক পুনঃসাইক্লিং হয়। তাই পুনঃব্যবহারের জন্য সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য, রাস্তাঘাট, হাটবাজারের বর্জ্য থেকে এক শ্রেণির মানুষ খুঁটে খুঁটে যোগাড় করে। কাঁচামাল হিসেবে সেগুলো পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে, শুকানো হয়। তার পর ছোট ছোট টুকরো করে তা বিক্রি করে। এই পণ্য রিসাইক্লিং হয়, মানুষ ব্যবহার করে। বোতল, গামলা, বালতি এমন সব ব্যবহার্য জিনিস নষ্ট হলে বা ভেঙে গেলে তা বর্জ্যে পরিণত হয় এবং একসময় মাটিতে ফেলে দেয়া হয়। প্লাস্টিকের মতো অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ বর্জ্য দৈনিক মাটিতে ফেলছে তার হিসাব আমাদের হাতের কাছে নেই। এ ছাড়া এমন ধরনের কতগুলো শিল্পকারখানা দেশে আছে তারও কোনো পরিসংখ্যান নেই। প্লাস্টিক শিল্পসহ অন্যান্য মিলে প্রায় ৭০০০ শিল্পকারখানা দৈনিক বর্জ্য উদগিরণ করে বুড়িগঙ্গা সহ অন্য নদীতে ফেলছে গণমাধ্যম প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শিল্পগুলোর মধ্যে ১১৭৬ টা শিল্পবর্জ্য মারাত্মক দূষণের সৃষ্টি করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "কেরানীগঞ্জের নিকটে বুড়িগঙ্গা নদীতীরে যেখানে ইঞ্জিনের বর্জ্যতেল, সহ শিল্পকারখানার তরল বর্জ্যের তলানি একই সাথে তৈরি পোশাকশিল্পের কাপড় ধোয়ার ময়লা পুরো এলাকায় বায়ূদূষণ করছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে পড়েছে।[৬] অন্য একটা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঐ ১১৭৬ টি শিল্পের মধ্যে ১১৪৯ টি শিল্প থেকে ৬৭.৭ মিলিয়ন লিটার তরল বর্জ্য মাটিতে মিশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। বুড়িগঙ্গা-তীরবর্তী ঢাকার ছোট-বড় কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, হাজারীবাগ ট্যানারির বর্জ্য, জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এই অবস্থা নিরসনে ট্যানারির ক্ষতিকর বিষয়টি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

শিল্পবর্জ্যের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশে নির্মাণকাজকে ঘিরে যে শিল্পব্যবস্থা বিদ্যমান, যাকে আমরা নির্মাণশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছি এই শিল্পেরও ব্যাপ্তি ঘটছে। পদ্মাসেতুর মতো মেগা প্রকল্পের কাজও চলমান। এই নির্মাণক্ষেত্র থেকে দৈনিক কী পরিমাণ বর্জ্য মাটির সাথে মিশেছে তার কোনো হিসাব কিন্তু হাতে নেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের আলোকে "দেশের রাজধানী ঢাকা সহ অন্যান্য শহর এলাকার নির্মাণশিল্প নির্গত বর্জ্যের পরিমাণ দৈনিক ১৬০৮৫ মে.টন। আগামী ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৪৭০০০ মে.টন ছাড়িয়ে যাবে"।[৭] নির্মাণশিল্পের বর্জ্যকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে কিছু বর্জ্য বিপদজনক, এবং কিছু কম বিপদজনক। প্রথম ভাগের বিপদজনক বর্জ্যের মধ্যে কংক্রিট ইট ও টাইলসের মিশ্রণ, শুকনো কাঠ, কাচ, প্লাস্টিক-এর মিশ্রণ-এর সাথে বিপদজনক ধাতুর সংযোগ। দ্বিতীয় ভাগে কম বিপদজনক বর্জ্যের মধ্যে পড়ে যেমন রং, বার্নিস, আঠার পাত্র, জিপসাম, তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল, এলুমিনিয়াম, সিসা, লোহা ও টিন। এদের সাথে প্লাস্টিকদ্রব্য তো থাকছেই। এসবই দৈনিক বর্জ্য আকারে আমাদের মাটির সাথে যুক্ত হচ্ছে।

প্লাস্টিক পলিমারের পর মেডিকেল বর্জ্যের বিষয়ে আলোকপাত করা হল। চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট বর্জ্যগুলোকে মেডিকেল বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর প্রকাশিত স্যুভেনিরে উল্লেখ করা হয়েছে 'প্রতিদিন হাসপাতালের একটা বেড থেকে গড়ে ১ কেজি করে বর্জ্য প্রকৃতির সাথে মিশছে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে এই খাতে দেশের মোট বর্জ্যের ৫.৭% ভাগই মেডিকেল বর্জ্য'।[৮] হাসপাতালে ব্যবহার্য প্লাস্টিক বা পলিমারজাত রক্তের ব্যাগ, স্যালাইন ব্যাগ, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ইনজেকশন, এসব পণ্য বহনের ব্যাগ বা পাত্র, এ ছাড়াও ব্যান্ডেজ, রোগীর রক্ত, পুঁজ সবই বর্জ্যাকারে আমাদের মাটির সাথে মিশছে। ব্যবহার্য One time use সিরিঞ্জগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশনাও প্যাকেটে লেখা থাকে। দেশের হাসপাতাল (সরকারি বেসরকারি) ক্লিনিকের এসব বর্জ্য নীরবে হেপাটাইটিস ভাইরাস, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, গ্যাংগ্রিনের মতো রোগ ছড়াচ্ছে। মেডিকেল বর্জ্যকে বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন ক্লিনিকের বর্জ্য, ল্যাবরেটরির (প্যাথলজিকাল) বর্জ্য। ক্লিনিক কিংবা হাসপাতালের রান্নাঘরের বর্জ্যও এই সাথে যুক্ত হচ্ছে এ বাদে দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ডাক্তারখানার বর্জ্য, যা এই পর্যায়ে বিবেচিত হয়। হাসপাতাল, ক্লিনিক ছাড়াও দেশে বিপণনের জন্য ওষুধের ছোট-বড় স্ট্রিপ দৈনিক যে কত পরিমাণে মাটির সাথে মিশছে তার কোনো হিসাবই নেই।

এরপর আমাদের গৃহস্থালির বর্জ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, ছোট-বড় শহর, বাজার এবং রাজধানী ঢাকার মতো অন্য সব বড় বড় শহরে ব্যক্তিনির্গত বর্জ্যের পরিমাণ যে কত তার কোনো হিসাব নেই আমাদের হাতের কাছে। মলমূত্রের মতো বর্জ্যের পরিমাণ কত তার পরিমাপ কখনও হয়েছে বলে শুনিনি। শুধুমাত্র ঢাকা শহরের যে চিত্র, তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানকার এ জাতীয় বর্জ্য দৈনিক বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীতে মিশছে। ঢাকা ওয়াসা পাগলাতে এই বর্জ্যের শোধনাগার পরিচালনা করছে। তারা সিটি উৎসারিত এই জাতীয় বর্জ্যের মাত্র ২০% শোধন করছে মাত্র। ব্যক্তিবর্জ্যের বাইরে গৃহস্থালির পরিত্যক্ত বর্জ্য শহরগুলোতে সংরক্ষিত ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে। সেখান থেকে তা কোনো বর্জ্যাধারে বয়ে নেয়া হচ্ছে। ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মোট এই ছয়টি সিটির উৎসারিত বর্জ্যের ওপর ২০১৫ সালের ৩০ জুন প্রকাশিত Asian journal of Medical and Biological Research যে তথ্য প্রকাশ করে, তাতে দেখা যাচ্ছে "১৯৯১ সালে ঐ সিটিগুলোর লোকসংখ্যা ছিল ২০৮৭২২০৪ জন। ঐ বছর উৎসারিত দৈনিক বর্জ্যের পরিমাণ ছিল ৯৮৭৩.৫ টন। ২০১৫ সালে তা বেড়ে ঐ ছয়টা সিটির জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭৪৪০০০০ জনে, তাদের উৎসারিত বর্জ্যের পরিমাণ দৈনিক দাঁড়িয়েছে ৪৭০৬৪ টন"।[৯] ঐ জার্নালে উল্লেখিত ছয়টি বড় শহরে কী কী বর্জ্য দৈনিক কী পরিমাণ উৎসারিত হচ্ছে তা-ও দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ঢাকা শহরে জৈব বর্জ্য, কাগজ, প্লাস্টিক, পোশাক শিল্প, কাঠ, চামড়া ও রাবার, ধাতব বর্জ্য, কাচ ও অন্যান্য মিলে দৈনিক ৫৩৪০ কেজি। চট্টগ্রাম শহরে ১৩২৫ কেজি। খুলনা শহরে ৫২০ কেজি। রাজশাহী শহরে ১৭০ কেজি। বরিশাল শহরে ১৩০ কেজি। ও সিলেট শহরে ২১৫ কেজি। Asian Journal of Medical and Biological Research-এ ২০১৫ সালের গবেষণায় ছয়টা বড় শহরের প্রায় আট কোটি মানুষের গৃহস্থালির বর্জ্যের হিসাবটা সামনে রেখে আমরা পুরো দেশের একটা হিসাব কষে ফেলতে পারি। ঢাকার অদূরে বা সন্নিহিত নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর একই সাথে রংপুর সহ দেশের অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলের একটা খসড়া হিসাব আমরা এভাবে খাড়া করতে পারি। দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ১৪ লাখ অর্থাৎ ঐ ছয়টা শহরের জনসংখ্যার দ্বিগুণ। তাহলে উৎসারিত বর্জ্যটাও দ্বিগুণ ধরলে দেশের শুধু গৃহস্থালির বর্জ্যের ভয়াবহ রূপটা

আন্দাজ করা যাবে। এসবের বাইরে দেশের বড় বড় শপিংমল থেকে শুরু করে গ্রাম-গাঁয়ের মুদি দোকানের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে সেখানে দেখা যাবে সাবান, সোডা, বিস্কুট, চকলেট, লবণ, হলুদ, মসলা সবই এখন প্লাস্টিক জাতীয় মনোরম প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। বাড়িতে, গাড়িতে, লঞ্চে, ট্রেনে ডালভাজা, চালভাজা, চাটনি পলিথিনের ছোট্ট প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। পানির বোতল, অন্যান্য কোমল পানীয়ের বোতল তো আছেই। এর সাথে প্রতিনিয়ত সিগারেটের ফিল্টার ক্যাপটা মাটিতে ফেলা হচ্ছে। পলিমারের এই ব্যাপক ব্যবহার এবং ব্যবহারশেষে সেগুলো প্রতিনিয়ত মাটিতে ফেলা হচ্ছে। রাস্তাঘাট, সর্বত্র এলোপাথাড়ি এই পলিথিন পতনের দৃশ্য যেন আমাদের চিরচেনা দৃশ্য। বাড়ির আশেপাশের খানাখন্দে এই সব পলিথিনের ছেঁড়া ব্যাগ, ছেড়া কৃত্রিম সুতোর কাপড়, রবারের জুতো, বোতল বর্জ্যাকারে আমাদের মাটির ব্যাপক ক্ষতি করছে। ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (আই আর আর আই) প্রকাশিত বুলেটিনে এই ক্ষতির ব্যাপকতার কথা বলা হয়েছে। পলিথিন মাটির সাথে মেশে না। মাটিতে পড়ে থেকে মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, ফলে মাটি উর্বরতা হারাচ্ছে। একটা সমীক্ষায় বলা হয়েছে ১৯৮২ সাল থেকে আমাদের দেশে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার শুরু হয়েছে। "শহরবাসী লোকজন দৈনিক ৬ থেকে ৭.৫ মিলিয়ন পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে। এর মাত্র ২০% ব্যাগ আহরিত হয়ে পুনঃব্যবহারে বা রিসাইক্লিং-এ যুক্ত হয়। বছরে ১৮০ থেকে ২০০ মিলিয়ন পলিব্যাগ পরিত্যক্ত থেকে যাচ্ছে"।[১০] এর সাথে যুক্ত হচ্ছে ফ্রিজ-টেলিভিশনের মতো পণ্যের মোড়কের সাথে থাকা শোলা, চিংড়িশিল্পে চিংড়িপোনা পরিবহনে ব্যবহৃত সুদৃশ্য কর্কশিট, হালে খাবার টেবিলে 'মাত্র একবার ব্যবহারের' জন্য সরবরাহকৃত প্লেট, গ্লাস পরিত্যক্ত হয়ে মাটির সংস্পর্শে আসছে, বর্জ্যের আয়তন বাড়াচ্ছে। শহর, বন্দর, গ্রাম-গাঁয়ের হাটেবাজারে কৃষিপণ্যের সাথে কাঁচা পাতা আনা হয়। আগের দিনে এ সব পাতা গরুছাগল ভেড়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। হাল আমলে কলা, লিচুর মতো ফলের ঝুড়ি কিংবা গাড়িতে যে পাতা থাকে তাতে প্রিজারভেটিভ হিসেবে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়, ঐ পাতা গরুছাগল ভেড়ায় খায় না, বর্জ্য আকারে মাটিতে পড়ে থাকে। পরিবেশ নোংরা করে মাটির ক্ষতি করে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে পুরো দেশটাই বর্জ্যের রূপ লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্বে প্রাযুক্তিক উন্নয়নের ধারায় ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়ে একেবারে রমরমা অবস্থায় পৌছেছে। বাংলাদেশেও ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যবহার এখন অনেক উঁচুতে। সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৩২ কোটি টন ইলেকট্রনিক পণ্য ব্যবহৃত হয়। আগেই বলেছি এ সমস্ত পণ্যের বর্জ্যকে বলা হচ্ছে ই-বর্জ্য। আমাদের দেশে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্য যেমন– কম্পিউটার, সেলফোন, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, ডিভিডি প্লেয়ার, সিএসএফ বালব ইত্যাদি। আশেপাশে তাকালেই দেখা যাবে ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যবহারের হার কত দ্রুত বাড়ছে। আমাদের ব্যবহৃত এসব ইলেকট্রনিক পণ্যের অভ্যন্তরে রয়েছে হাজার রকমের ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান। এসব উপাদানের মধ্যে মানবদেহে সরাসরি ক্ষতি সাধন করছে সিসা, পারদ, দস্তা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়াম সহ অনেক ধাতু। আমাদের দেশে ব্যবহৃত এসব দ্রব্যের প্রায় ২০-৩০% ভাগ পণ্য রিসাইক্লিং হয়ে পুনরায় ব্যবহৃত হয় বাকি ৭০-৮০% শতাংশই বর্জ্যের আকারে আমাদের মাটিতে মিশছে। আধুনিক সভ্যতার সাথে ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যবহার এতটা নিবিড় যে এগুলো ছাড়া আমাদের জীবনই যেন সেকেলে থেকে যায়। এসব পণ্যের ব্যবহার এখন আমাদের সভ্যতার মাপকাঠিও বটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) ইতোমধ্যে ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে মর্মে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর দেশে ৩ কোটি মোবাইল ফোন আমদানি করা হয়। ব্যবহৃত এসব মোবাইলের বর্জ্য থেকে রিসাইক্লিং করে মূল্যবান ধাতব বস্তু বের করা সম্ভব। আমাদের দেশ থেকে এমন সব ই-বর্জ্য সিঙ্গাপুর, চীন, ভারতে রফতানি হয়। তাই ই-বর্জ্যের রিসাইক্লিং-এর জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা জরুরি। এই সব ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত না করা হলে তা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করবে। ই-বর্জ্য ভারী ধাতু বহন করে, তাই এগুলো মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ঢাকার রোগতত্ত্ব, রোগ নির্ণয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রদত্ত তথ্য মতে গৃহস্থালির ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক দ্রব্য উদ্ভূত ই-বর্জ্যের ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশি। অপচনশীল এসব বর্জ্য মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে। এসবের প্রভাবে মানবদেহে ক্যান্সার আক্রমণ, শ্বাসকষ্ট, কিডনি ও লিভারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমাদের অন্যসব বর্জ্যের বিশাল বোঝার উপর ই-বর্জ্য শাকের আঁটির মতো হলেও এর ক্ষতির প্রভাব কিন্তু অনেক বেশি।

চার.

সভ্যতার ইতিহাস সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ নয়, তা সমগ্র কিংবা অঞ্চলবিশেষের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনের অগ্রগতি ও সৃষ্টিশীলতার কথা। প্রাকৃতিক নিয়ম বা তন্ত্রে চলমান প্রকৃতির স্বাভাবিক শাশ্বত ধারাকে মানুষের সুখের পথে পরিচালনায় সৃষ্টিশীল অগ্রযাত্রার নামই সভ্যতা। যদিও প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রকৃতিই মানবচরিত্রের নিয়ন্ত্রক, তবুও সৃষ্টিশীলতা থেমে নেই। প্রকৃতির এই শাশ্বত তন্ত্রে ব্যাঘাত ঘটলে বা ঘটালে, তা সামাল দিতে যে পথ অবলম্বন করা হয় তাকেই বলা হয় 'ব্যবস্থাপনা' ইংরেজিতে Management। সহজভাবে বলা যায় কোনো System ভেঙে পড়লে ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি সামনে আসে। এই সূত্রে আমাদের মাটি, পানি, আলো, বাতাস সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে প্রতিবেশের গরমিলকে বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কর্মপন্থা নির্ধারণ এখন জরুরি। কবিগুরুর ভাষায় 'ঝাড়ু দিয়ে অন্ধকার দূর করা যাবে না' আবার 'চোখ বুজলে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না'। ইতোমধ্যে আমাদের মাটি ও পানির যে হাল হয়েছে তা কেবল উদ্বেগজনক নয়, তা মারাত্মক ও ভয়াবহ। উপরের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য কিছু উৎসের কথা এসেছে মাত্র, আবার ঐ সকল উৎস থেকে উৎসারিত বর্জ্যের সঠিক পরিমাপ কিন্তু আসেনি। আলোচিত এসব উৎস ছাড়াও ছোটখাটো হাজারো উৎস থেকে নিয়ত বর্জ্য নির্গত হচ্ছে, যার সঠিক পরিমাণ প্রাপ্ত পরিমাণের সাথে যুক্ত হলে এর ভয়াবহতার মাত্রাও বাড়বে।

আমাদের দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নামে পরিচালিত কর্মধারা কেবলমাত্র বড় বড় সিটি কর্পোরেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা-ও সব সিটি নয়। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তার অধীনস্থ এলাকার আবাসিক ভবন, বাজার, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাজ করছে। জাপানি একটা সংস্থা জাইকা (JICA) সিটি কর্পোরেশনের কাজে সহায়তা দিচ্ছে। তবে বর্জ্যের পরিমাণ নিয়ে অন্য সংস্থার সাথে তাদের হিসাবের গরমিল আছে । ঢাকা সিটির (উত্তর ও দক্ষিণ) উৎসারিত বর্জ্যের পরিমাণ নিয়ে জাইকা বলছে দৈনিক সেখানে ৩২০০ টন বর্জ্য পতিত হচ্ছে। একই বিষয়ে WWW-Waste Concern-এর ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত চিত্র অন্যরকম। আবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (উত্তর ও দক্ষিণ) ৮২ টি ওয়ার্ডে ৭১৫৬ জন মানুষ এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত। সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতাও সীমিত। তাছাড়া এরা যে পরিমাণ বর্জ্য দৈনিক অপসারণ করছে শতকরা হারে তা ৪৪ মাত্র। বস্তুত এদের কাজটা হচ্ছে

শুধু বর্জ্য স্থানান্তর করা। অর্থাৎ ডাস্টবিন থেকে তুলে বর্জ্যাধারে (Dumping Station) ফেলা। ইতোপুর্বে লালবাগ, মাতুয়াইল, মিরপুরের বর্জ্যাধার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ভাষানটেক, আমিনবাজার, কামরাঙ্গীর চর ও বাড্ডার বর্জ্যাধারও পূর্ণ হবার পথে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ নিকটবর্তী স্থানে নতুন বর্জ্যাধারের জায়গা অনুসন্ধান করছে।

এসব বিষয়ে বিদ্যমান আইন এবং তা প্রয়োগের অধিক্ষেত্রের দিকে তাকালে আলোচ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। (The Dhaka Municipal Ordinace-1988) শীর্ষক আইন। উল্লেখিত আইনের এতদবিষয়ে চারটা ধারা: এগুলো হল র,৭৮(1) The corporation shall make adequate arrangement for removal of refuse from all public streets, public latrines, drains and all buildings land vested in the corporation and for the collecton and proper disposal of such refuse. ii, 78 (2) তে বলা হয়েছে- The occupiers of all buildings and land within the corporation shall be responsible for removal of refuse from such buildings and lands subject to general control and supervision of the corporation. iii, 78(3) এখানে বলা হল The corporation may provide public dustbin and other suitable receptacles at suitable places, The corporation may by public notice require all refuse accumulating in any premises and land shall be disposed by the owner or occupier of such premises of land in such dustbins or receptacles. একই ভাবে রা, ৭৮(৪)-এ বলা হয়েছে– All refuse removed and collected by the staff of the corporation or under their control and supervision and all refuse deposited in the dustbins and other receptecales provided by the corporation. দেখা যাচ্ছে এ আইনের অধিক্ষেত্র শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন ও তা বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ঢাকার পর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে আমরা ভিন্নধর্মী কিছু কর্মধারা দেখতে পাব। ছোট-মাঝারি পাহাড় টিলাসমৃদ্ধ কর্ণফুলী তীরবর্তী চট্টগ্রাম দেশের অন্যতম সমুদ্রবন্দর। একদা ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন একটা নগরী। হালে এর রূপ পাল্টে গেছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শহরে এখন দৈনিক প্রায় ২২২০ টন বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে, ফলে নগরীর পরিচ্ছন্ন চেহারা্র পরিবর্তন ঘটেছে। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য অপসারণ কিংবা এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের ঘাড়ে। ২০০৪ সালে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে এবং অর্থায়নে হালিশহরের বর্জ্যাধারের বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন, একই সাথে জঞ্জালগুলো আলাদা করার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। নিঃসন্দেহে একটা ভিন্নধর্মী উদ্যোগ। প্রকল্পের বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদিত হবে উপজাত (By product) পণ্য হিসেবে যা আমাদের ফসল উৎপাদন ব্যবহৃত হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, জনবল ও অর্থের অভাবে এই বৃহৎ প্রকল্প কিন্তু কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। চট্টগ্রামের পর খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিষয়টি আমাদের সামনে আসে। মিলকারখানাসমৃদ্ধ খুলনার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভার খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত। জাপানি সংস্থা জাইকা (JICA) এবং অন্য কয়েকটা বেসরকারি সংস্থা এখানকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। এমনিভাবে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নয়' শুধুমাত্র বর্জ্য অপসারণের দায়িত্ব কর্পোরেশন কিংবা পৌরসভা পালন করে থাকে। বলতে গেলে সকল ক্ষেত্রেই শহর পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মধারার মধ্যেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ছাড়াও আমাদের দেশের বড় বড় শহরের বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ নিয়ে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) কাজ করছে। পরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে তারা

বর্জ্য নিয়ে গবেষণাধর্মী কিছু কর্মকা- পরিচালনা করছে। শহর এলাকার প্রাপ্ত বর্জ্যের মধ্যে থেকে জৈব ঘন বর্জ্য (Organic soild waste) বাছাই করে তা থেকে জৈব সার উৎপাদনে কাজ করছে এমন একটা সংগঠন 'Waste Concern' নামের একটা বেসরকারি সংস্থা। নেদারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় বস্তিবাসীদের উন্নয়নে কাজ করছে তারা, লক্ষ্য পরিবেশ উন্নয়ন। এমনি ধারার আরও একটা সংস্থা 'Prism' ১৯৮২ সাল থেকে তারা খুলনা সিটিতে 'Community Based Urban Waste Treatment' প্রকল্প পরিচালনা করছে। সভা, কর্মশালা, সেমিনারের মতো কাজের মধ্য দিয়ে তারা এতদবিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলছে। এদের মূল কাজ হল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে উৎসারিত বর্জ্য রিসাইক্লিং করা। ঢাকা শহরেও এদের কর্মধারা চোখে পড়ে। এমনি একই ধারায় দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ[a] 'Dushta Shasthya Kendro' (DSK), CARE, প্রদীপন এবং ক্লিন কলাবাগান ঈষবধহ কধষধনধমধহ নামের আরও কয়েকটা সংস্থা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের ভূমিকা রাখছে। দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বস্তি এলাকার জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ওপর শিক্ষাদান করছে। কেয়ার 'শহর প্রজেক্ট'র নামে USAID-এর অর্থায়নে টংগী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ শহরের বস্তি এলাকার পরিবেশকে সুস্থ রাখতে কাজ করছে। বেসরকারি সংস্থা প্রদীপন কাজ করছে খূলনা সিটিতে। 'Swiss development co-operation' থেকে এরা আর্থিক সহায়তা লাভ করছে। খুলনা শহরের চিকিৎসা বর্জ্য (Medical waste) নিয়েই এদের কাজ। 'Clean Kalabagan' নামের বেসরকারি সংস্থাটি কাজ করছে রাজধানীর কলাবাগান, কাঁঠালবাগান, ধানমন্ডি, উত্তরা, বনানী, মিরপুর এবং শ্যামলীতে। এদের কাজও জৈব ঘন বর্জ্য rganic solid waste নিয়ে।

বর্জ্য অপসারণ কিংবা তা স্থানান্তর করে পরিবেশ দূষণ রোধে আইনি পদক্ষেপের দিকে একটু লক্ষ করি। এ বিষয়ে 'The Enviornment policy 1992'-তে বলা হয়েছে পৌরও সিটি কর্পোরেশনের শিল্পকারখানার এবং কৃষিজ বর্জ্য নদী, পুকুর কিংবা ড্রেনে বা নর্দমায় ফেলা যাবে না। একই সাথে এ আইনে বর্জ্য বহনকারী খোলা ট্রাক দিনের বেলায় চালাচলকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনি ধারায় 'Enviornment Conservation Rule 1997'-এ বলা হয়েছে 'গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক ও শিল্পকারখানার বর্জ্য ফেলে জমি ভরাট একটা বিপদজনক লাল তালিকাভুক্ত কর্মকা- (Red Category Activity) । এ ধরনের কাজ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বাহ্নে অনাপত্তি পত্র গ্রহণ ছাড়া করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা আমাদের 'The Factory Act 1965'-এর দিকে তাকালে সেখানে দেখতে পাব কোনো শিল্পকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কারখানা এলাকায় পর্যাপ্ত আলোবাতাস, খাবার পানির ব্যবস্থা, সাথে টয়লেট-ল্যাট্রিন স্থাপনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, এর সাথে উদগিরিত ধোঁয়া, ধুলাবালি যাতে পরিবেশ দূষিত না করে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা একইসাথে উৎসারিত বর্জ্য এবং দূষিত পানি অপসারণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মাত্র। এতদবিষয়ে অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমাদের 'Penal Code'-এ ৬ মাসের কারাবাস ও ২০০০ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে নদীদূষণের মতো পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর কর্মকা- বন্ধ করতে ২০১১ সালের ১ জুন ঢাকা হাইকোর্টের কিছু নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে সেখানে দেখা যাবে Human Rights and peace for Bangladesh নামের একটা সংস্থার আইনি নোটিশের ওপর শুনানির পর মহামান্য হাইকোর্ট কিছু নির্দেশনা সম্বলিত রায় প্রদান করে। ঐ নির্দেশনায় বুড়িগঙ্গার সাথে সংযুক্ত সকল ময়লার সংযোগ ১ বছরের মধ্যে বন্ধ করতে বলা হয়। বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী সকল অবৈধ স্থাপনা, দখল উচ্ছেদ করতে (বিআইডব্লিউটি)-এর চেয়ারম্যানকে বলা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে এ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়তে কার্যকর প্রচার-

প্রচারণা চালাতে বলা হয়। হাইকোর্টের এই আদেশ সম্বলিত প্লাকার্ড বুড়িগঙ্গার ধার দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে বলা হয়। মোটামুটি আমাদের পরিবেশ উন্নয়নের কথা বলি, আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথা বলি এই ধরনের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত আইনি ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো কর্মকা- চোখে পড়ে না।

পাঁচ.

কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দিনের পর দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের মাটি ও পানি প্রতিনিয়ত বর্জ্যের চাপে তার প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান (Eco System) হারিয়ে ফেলছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই ভূ-ভাগের গঠন, এর গৃহরচনা, এর সাথে হাঁস-মুরগি গরু-ছাগল নিয়ে '৭৫' পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত যে ভারসাম্য নিয়ে এগিয়ে চলছিল সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। একটা দরিদ্র দেশ থেকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দাঁড়াতে গিয়ে আমরা যে বর্জ্যের জন্ম দিয়েছি এবং প্রতিনিয়ত দিচ্ছি, সেই বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আমাদের সামনে এসেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতের প্রয়াত রাষ্টপতি-বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম তাঁর বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু কথা বলতে হচ্ছে। প্রয়াত ঐ বিজ্ঞানী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন আমাদের ধরিত্রী যে পরিমাণ মানবসন্তানের জায়গা দিতে পারে তা এখন প্রান্তিক পর্যায়ে। ধরিত্রীর শক্তির উৎসও সীমাবদ্ধ। এমনি অবস্থার ধরিত্রীর ভারসাম্য রক্ষায় খাদ্য ও জ্বালানির বর্জ্যের মধ্য থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের জন্য তিনি গবেষণার আহবান জানিয়ে ছিলেন। ঐ বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর ঐ আহবান সুফল দিতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে দৈনিক মাটি ও পানির সাথে যে পরিমাণ বর্জ্য সামিল করছি, তার যে হিসাব দেয়া হয়েছে তা কেবল আমাদের শহরাঞ্চলের সিটি কর্পোরেশনগুলোর বর্জ্যের হিসাব। সারা দেশের হিসাব হাতে নেই। ১৬ কোটি মানুষের শরীরনির্গত বর্জ্য, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, আহার্য, খেলাধুলা, সভা-সমিতি, ঈদ-পুজোর মতো পালা-পার্বণ, বিয়ে-বৌভাতের অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে পতিত বর্জ্যের হিসাব করাও কঠিন, কারণ এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। বর্জ্য পতন থেমে নেই, থেমে থাকার কথাও নয়। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে, বিশেষ করে প্লাস্টিক শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে। শিল্প হিসেবে এর কদরও বাড়ছে। তাই এর ত্যক্ত বর্জ্যের হিসাব কষার সময় আমাদের নেই। পতিত বর্জ্যের প্রভাবে ডেংগু মারাত্মক রূপ নিয়েছে। প্রাণঘাতী রোগের ভয়াবহতা বাড়ছে। চিকিৎসার জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবারও হার বেড়েছে, বাড়ছে। মানুষ আমরা– আমাদের রোগের চিকিৎসা নিতে বিদেশে ছুটছি। কিন্তু আমাদের ধারণকারী ধরণী, তার মাটি ও পানির রোগ নিয়ে কোনো ভাবনাই যেন আমাদের নেই।

আমরা লক্ষ করেছি যে, বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত বিপুল পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্ট হুমকি মোকাবেলায় চিন্তাভাবনা চলছে, কাজকর্মও চলছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। কাজকর্ম যেটা চলছে তা কেবলমাত্র বড় বড় শহরের সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কিত আইনের অধিক্ষেত্রও খুব ছোট। Waste concern নামের একটা বেসরকারি সংস্থা বর্জ্য রিসাইক্লিং-এর ওপর কাজ করছে। এই সংস্থাটা নিম্নস্তর থেকে উচুস্তরের ভুক্তভোগীদের সমন্বয়ে কর্মশালারও আয়োজন করছে। তাদের কৌশলটা অংশগ্রহণমূলক এবং বেশ কার্যকর। জাতিসংঘের আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্র (UNCRD) ও জাপান সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যৌথ সহায়তায় সংস্থার কাজের পরিধিও বেড়েছে। পরিকল্পনা

বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে Waste concern । তাদের কর্মসূচির মধ্যে আছে তিনটা জ. যেমন–Reduce বা কমানো, Recycle বা পুনঃব্যবহার উপযোগী করা এবং Refuse অর্থাৎ ফেলে না দিয়ে যতদূর সম্ভব তা ব্যবহার করা। ৩ টা জ এখন ৫ জ-এ নেয়া হয়েছে, অতিরিক্ত দুটো জ হল Re-Think পুনঃচিন্তন ও Re-covery বা পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি। আমাদের আলোচ্য 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনার' বিষয়টি জব-Think-এর আওতায় আমাদের ধারণাকে কিছু প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তির দিকে নেয়ার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত দ্রব্য, যাকে আমরা বর্জ্য বা বর্জনীয় আখ্যা দিচ্ছি, সেই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কোনো দ্রব্য শুধু বর্জনীয় বললেই 'বর্জ্য' পদবাচ্য হবে না, যতক্ষণ তা আমাদের মাটি বা পানি তা আত্মস্থ করার ক্ষমতা রাখছে। আমাদের মাটি ও পানি তার স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থান ক্রিয়ার মধ্যে প্রাপ্ত বর্জ্য প্রাকৃতিক নিয়মে রিসাইক্লিং করে মাটির উর্বরতা বাড়াচ্ছে পানির গুণাগুণেরও ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে না। তাই 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনার' ধারণার সাথে মাটি ও পানির প্রাকৃতিক নিয়মকে যুক্ত করে ভাবতে হবে। বিদ্যমান ধারায় বর্জ্য মাটিতে পুঁতে ফেলে বা পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে কিংবা কৃত্রিম ব্যবস্থায় রিসাইক্লিং করে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিন্তা কার্যত মাটি ও পানির সাথে বাতাসও বর্জ্য রূপ পরিগ্রহ করবে। প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি মানুষ প্রকৃতির দাস, প্রকৃতিই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রকৃতির নিয়মে পানি তার বাস্তুসংস্থানের মধ্যে তরল বর্জ্য হজম করবে, একই ভাবে মাটি ও তার বাস্তুসংস্থানের মধ্যে ঘন বর্জ্য হজম করবে। মাটি ও পানির এই ক্রিয়ার সাথে মানুষ অর্থাৎ আমরা যে বর্জ্য ব্যবহারে বা রিসাইক্লিং-এর পন্থা অবলম্বন করব, সমন্বিত এই কর্মধারাকেই 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' বলা যাবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথম কাজটা হবে বর্জ্য পৃথকীকরণ। মাটিতে মিশে যায় এমন বর্জ্য, পানিতে মিশে যায় এমন বর্জ্য এবং যে সকল বর্জ্য মাটি কিংবা পানি হজম করবে না সেগুলো পৃথক করা । পৃথকীকরণের এই কাজটা গৃহস্থালি থেকে শুরু করতে হবে, তাহলে খরচ কমবে। প্লাস্টিক দ্রব্য, পলিমার যেমন– পলিথিনের, ছোট-বড় ছেঁড়া প্যাক,ব্যাগ, বোতল এমনসব শক্ত বর্জ্য পৃথক করে আলাদা পাত্রে রেখে পৃথক ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। শহরে, বাজারে, বাসে-ট্রেনে, গাড়িতে, পার্কে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় পৃথক ডাস্টবিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডাস্টবিন থেকে রিসাইক্লিং-উপযোগী দ্রব্যগুলো আলাদা করা সহজ হবে। রিসাইক্লিং উপযোগী বর্জ্য আলাদা করার পর পরই ডাস্টবিনের এ-জাতীয় বাকি বর্জ্য ধ্বংস করতে হবে, এবং তা প্রতিদিনই। এই ধ্বংসক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট কার্বন যাতে বাতাসের ক্ষতি না করে সেটাও ভাবতে হবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে প্লাস্টিকের মতো লাভজনক শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধের প্রয়োজন পড়বে না। উল্টো প্লাস্টিক বর্জ্য ধ্বংস করার জন্য নতুন ক্ষেত্র গড়ে তোলা যাবে। প্লাস্টিক বর্জ্য ধ্বংস করতে গড়ে ওঠা প্রযুক্তিক ধারায় নতুন কর্মক্ষেত্রও সৃষ্টি হবে। এ কাজে কাঁচামালের উৎস যখন বর্জ্য, তখন সারাদেশের ওগুলো সংগ্রহ করার জন্য আপন গরজে ডাস্টবিন গড়ে উঠবে। সিটি কর্পোরেশনের ওপর চাপও কমে যাবে।

বাসা-বাড়ি, হাট-বাজার, দোকানপাট, হাসপাতাল সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাপড়, ঝুট, প্লাস্টিকের বস্তা, পুরাতন কাপড়, বাদ দেওয়া শীতবস্ত্র সবই পৃথকস্থানে ফেলে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মৃতদেহ সৎকারে লাশের কাফনে ১০০% সুতি কাপড় ব্যবহার করা জরুরি। দামি কাপড় ব্যবহার করা হলে লাশ মাটিতে পচতে দেরি হবে যা মাটির ক্ষতি করছে। মাটিতে কিংবা পানিতে কোনো কিছু ফেলার আগে ভাবতে হবে ঐ দ্রব্য মাটি কিংবা পানির ক্ষতি করবে কি না। ধাতব বর্জ্য-র সাথেই ই-বর্জ্যও পৃথক করার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ই-বর্জ্যের শক্ত দ্রব্যগুলো যা কাঁচামাল হিসেবে শিল্পে ব্যবহার করা যাবে, তা বাদে সকল ধাতব বর্জ্য আলাদা করে ধ্বংস করার ব্যবস্থা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকবে। দেশের পোল্ট্রি শিল্পে মুরগির পায়খানা পানিতে ফেলে সেখানে রাক্ষুসে মাছের চাষের প্রবণতা বাড়ছে। মাগুরজাতীয় রাক্ষুসে মাছের খাদ্য হিসেবে কুকুর, বিড়ালের মৃতদেহ, গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্জ্যের এই ব্যবহার মাটির বা পানির ক্ষতি করছে কিনা সেদিকে লক্ষ করা হচ্ছে না। পৃথিবীর পানিসম্পদের মাত্র ২.৫ ভাগ মিষ্টি পানি, এর মধ্যে মাত্র ০.০২৫ ভাগ খাবার যোগ্য পানি। বাকি সব পানি লোনা। তাই আমাদের প্রয়োজনে পানিদূষণ বন্ধে পানিতে মুরগির পায়খানা, গরুছাগলের নাড়িভুড়ি, মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি পরীক্ষা করা দরকার। আগের দিনে ফিরে যাবার চেষ্টা এখন বৃথা। তাই গৃহস্থালি, কৃষিখামার, মৎস্যখামার সহ সকল উৎসের পানির বাস্তুসংস্থান ক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া জরুরি।

কোনো জিনিস মাটিতে পুঁতে ফেললে যেন আমরা বেঁচে যাই, দুশ্চিন্তামুক্ত হই। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আগে মানুষ ডাকাতের ভয়ে সোনাদানা ধাতবমুদ্রা মাটিতে পুঁতে রাখত। ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে আমরা সে ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছি। এবারে মাটিকে বাঁচাতে বর্জ্য পুঁতে ফেলার ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ কারণে আমাদের সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করতে হবে, সচেতন হতে হবে। এ কাজে সকলের অংশগ্রহণে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। 'আমাদের ক্ষতি আর আমরা করব না' এই উক্তির যৌক্তিকতা খুঁজতে কোন উদাহরণ হাজির করতে হবে না। আমরা আমাদের পাশে ছেঁড়া

পলিথিন, ছেঁড়া কাপড়, চিপসের প্যাকেট, চকলেটের ছোট-বড় মোড়ক যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তা মাটির সাথে মিশছে না শুধুই মাটির ক্ষতি

করছে। মাটি প্রতিনিয়ত তার উর্বরতা হারাচ্ছে। পলিথিনের মতো অপদ্রব্য মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে। শহরের ড্রেন, গ্রামের নর্দমা এখন পলিথিনের মতো অপদ্রব্যে ছেয়ে গেছে। তই এখন আমাদের বর্জ্য সম্পর্কিত ভাবনা এবং এর ব্যবস্থাপনার ইস্যুটি শহর-বন্দর ছাড়িয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে হবে।

আমাদের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার মতো সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-এর সাথে মসজিদ, মন্দির, ক্লাব প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলকেও এতদবিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সকল শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে বাস্তব ধারণা দিতে প্রয়োজনে বিষয়টি পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের আয়োজন করা যেতে পারে।

একইসাথে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে ইতোপূর্বে পলিথিন বন্ধের আইন ও ধূমপান বিরোধী আইন করেও তা কিন্তু কার্যকর করা যায়নি। তাই আইন করে, আইনের ওপর ছেড়ে দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। মাটি, পানি, বাতাস অর্থাৎ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে মানুষের চিন্তাশক্তির প্রবাহ এক সূত্রে গেঁথে নেওয়াই এখন কাজ।

তথ্যসূত্র :

১। সতীশ চন্দ্র মিত্র– যশোর খুলনার ইতিহাস (১ম খ- পৃষ্ঠা-২২৭)

২। সতীশ চন্দ্র মিত্র– যশোর খুলনার ইতিহাস (১ম খ- পৃষ্ঠা-৩২০)

৩। মোঃ আফসার আলী– গাঙদ্বীপের সাতকাহন পৃষ্ঠা-০৮

৪। ফারজানা নাসরিন– International Research Journal of Social Science Vol 5 (10) Oct-2016

৫। নাসরিন সুলতানা– Plastic Recycling in Bangladesh (Article)

৬। নাসরিন সুলতানা– Plastic Recycling in Bangladesh (Article)

৭। ফারজানা নাসরিন– International Research Journal of Social Science Vol 5 (10) Oct-2016

৮। ফারজানা নাসরিন– International Research Journal of Social Science Vol 5 (10) Oct-2016

৯. আনোয়ারুল আবেদিন– এম জহির উদ্দীন Asian Journal of Medical and Biological Research

১০। এফ এইচ চৌধুরী ও অন্য তিন জন Construction Waste Management practice: Bangladesh Perception.

[লেখক: গবেষক]

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

এম. ফি রো জ আ হ্ মে দ

ভূমিকা

বাংলাদেশে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং উচ্চ আর্থিক প্রবৃদ্ধির দেশ শহরগুলোতে, লোকসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার গড়ে প্রায় ৩ শতাংশ। দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যের সৃষ্টির ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে অনিয়ন্ত্রিত দ্রুত নগরায়ন বড় বড় শহরগুলোতে বর্জ্যের স্তূপ সৃষ্টি করছে এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে নাগরিক জীবন ও পরিবেশের ওপর অনেক প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সাধারণত কয়েকটি স্তরবিশিষ্ট:-

- গৃহস্থালি বা বর্জ্যের উৎস;
- সংগ্রহ ও ময়লার বিন বা ট্রান্সফার স্টেশনে বর্জ্য জমা করা;
- ময়লার বিন ও ট্রান্সফার স্টেশন থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন;
- চূড়ান্ত ডিজপোজাল ।

প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে বর্জ্য পরিবহন ও ট্রান্সফার স্টেশনে বর্জ্য জমা করার কাজটি সাধারণত এলাকাভিত্তিক সংগঠন বা সমিতি করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি সাধারণত দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ স্তরের কাজ করে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতি স্তরেই কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। সম্মিলিত সমস্যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কম বর্জ্যের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বর্জ্যের এটলাস (১৯১৩) অনুসারে বাংলাদেশে প্রতিজন বৎসরে গড়ে ১৫০ কেজি অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ০.৪১ কেজি বর্জ্য সৃষ্টি করে। সিটি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি এ বর্জ্যের মাত্র ২০ শতাংশ অপসারণ করে থাকে।

বর্জ্যের উৎস: কমপোজিশন ও সংগ্রহ পদ্ধতি

মিউনিসিপ্যালিটিতে বর্জ্যের প্রধান উৎস গৃহস্থালির দৈনন্দিনের কর্মকা-। জৈব বর্জ্যের উৎস হল খাদ্য প্রস্তুত ও খাদ্য গ্রহণকালে ফেলে দেওয়া অভুক্ত অংশ। এছাড়া বাসাবাড়িতে উৎপন্ন অন্যান্য বর্জ্যের মধ্যে থাকে কাগজ, প্লাস্টিক, কাপড়, কাঠ, মেটাল ও অন্যান্য বর্জ্য। ঝাড়ু দিয়ে জমানো বর্জ্য, কাটা ঘাস ও গাছপালা এবং নির্মাণ কাজে অব্যবহৃত আবর্জনা মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে উৎপন্ন মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যের মধ্যে যেসব বস্তু থাকে তার একটা আপেক্ষিক পরিমাণ চিত্র নং- ১-এ দেখানো

হল। তবে স্থান, শহর এমনকি একই শহর বা নগরের এলাকা ভেঙে এই কমপোজিশনে আমূল পরিবর্তন হতে পারে। গৃহস্থালির আবর্জনার মধ্যে জৈব বর্জ্যের পরিমাণ সব সময়ে বেশি থাকে।

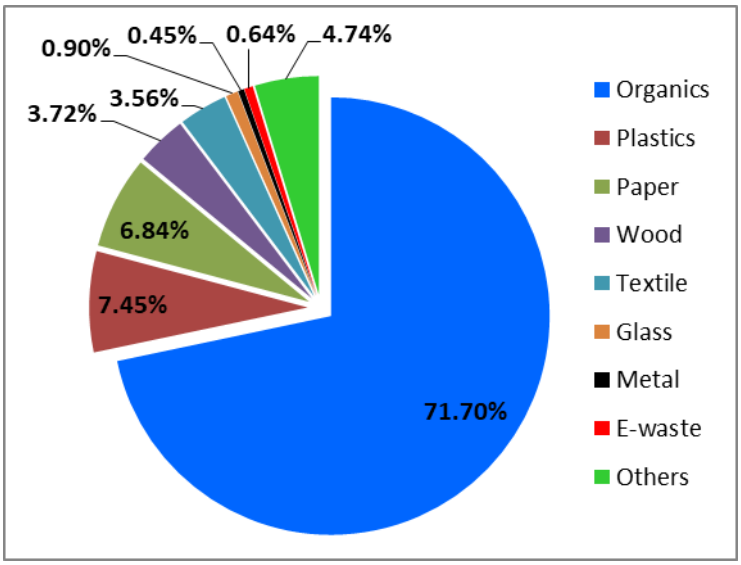

ঢাকা নগরীতে 'ডোর-টু ডোর' বর্জ্য সংগ্রহের ওপর সিটি কর্পোরেশনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিভিন্ন সংগঠন এলাকাভিত্তিক সমিতির মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করে ট্রান্সফার স্টেশনে জমা করে। সিটি কর্পোরেশনের ট্রান্সফার স্টেশন থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও সমিতির ভ্যান থেকে ট্রান্সফার স্টেশনে বর্জ্য জমা করার সমন্বয় না থাকায় ট্রান্সফার স্টেশন প্রায়ই বর্জ্যমুক্ত থাকে না। বেসরকারি বর্জ্য সংগ্রহের প্রতিষ্ঠানসমূহের সিটি কর্পোরেশনে নিবন্ধিত হওয়ার নিয়ম থাকলেও এক-তৃতীয়াংশ বর্জ্য সংগ্রহকারী ব্যক্তি বা সংগঠন নিবন্ধন না করে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছে। বসতবাড়ি থেকে এই সমিতি প্রতি পরিবার থেকে প্রতি মাসে ১৫০ টাকা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে এর দ্বিগুণ এবং রেস্টুরেন্ট থেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০০০ টাকা করে সংগ্রহ করে। প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন মতে রাজধানীতে প্রতি বছর ৪৫০ কোটি টাকার ময়লা-বাণিজ্য হয়ে থাকে। চট্রগ্রাম ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য সংগ্রহে শৃঙ্খলা এনেছে। এই দুই সিটি কর্পোরেশনে বাসাবাড়ি থেকে নিজস্ব কর্মী দ্বারা 'ডোর-টু ডোর' কার্যক্রমের মাধ্যমে সরাসরি বর্জ্য সংগ্রহ করে। এই দুই সিটি কর্পোরেশন গৃহকরের সাথে যে পরিচ্ছন্নতা কর নেয় তা থেকে বর্জ্য পরিবহনের ভ্যান, ঘরে ঘরে বর্জ্য রাখার পাত্র, এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি দেওয়া হয়। নগরবাসীদের ময়লা সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোনো টাকা দিতে হয় না। বর্জ্য সংগ্রহ ও সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য পরিবহনের সমন্বয় থাকায় কোথাও বর্জ্যের স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা যায় না। সিটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ঢাকা সিটিতে আগের ৯৩ টি ওয়ার্ডের সাথে বর্তমানে ৩৬টি নতুন ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে ১২৯টি ওয়ার্ড হয়েছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন গ্রাহকদের কাছ থেকে ৩ শতাংশ হারে পরিচ্ছন্নতা কর আদায় করছে। দুই সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্নতা বাবদ ১৫০+ কোটি টাকা আদায় করে এবং তা থেকে বর্জ্য পরিবহন ও ডিসপোজালের খরচ মেটাতে হয়। বর্জ্য সংগ্রহকারী সমিতিগুলো বর্জ্য সংগ্রহ ও ভ্যানে করে ট্রান্সফার স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য ৪৫০ কোটি টাকা আদায় করে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য সংগ্রহ নিজে করে ঐ টাকা আদায় করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি হত।

ঢাকা সিটিতে যত্রতত্র ময়লা ফেলার অভ্যাস ঢাকাবাসীর। ঢাকা সিটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রধান সড়কগুলোতে ফুটপাথের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে ময়লার বিন স্থাপন করা হয়। ডিজাইন ও ব্যবহার-উপযোগিতা বিবেচনায় বিনগুলো ভালো ছিল এবং কিছু পথচারী ব্যবহারও করছিল। কিন্তু স্থাপনের এক বৎসরের মধ্যে এই ব্যবস্থা অকেজো প্রমাণিত হয়। এই বিনের কিছু অংশ হারিয়ে গেল, আবার কিছু চুরি

হল এবং পথচারীরা তাদের পুরনো অভ্যাসে ফিরে গেল। মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন না হলে কোনো ভাল উদ্যোগও কাজ করে না।

ঢাকা সিটিতে অধিকাংশ ট্রান্সফার স্টেশন ডিমাউন্টেবল কনটেইনার রাখা হয় কিন্তু এই ময়লা জমা করার কোনো স্থানেই নানা কারণে একটা ভাল পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য আবাসিক এলাকা বা কারো বাড়ির পাশে বর্জ্য জমা রাখার বা ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপনে প্রবল আপত্তি আসে। বাধ্য হয়ে সিটি কর্পোরেশন সুবিধামতো কোনো রাস্তায় এসব ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপন করে। এতে করে রাস্তার যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং বর্জ্য সংগৃহীত না হলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় এবং বর্জ্য রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে মানুষের চলাচলের বিঘ্ন ঘটে এবং পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করে। যেখানে সিটি কর্পোরেশন উপযুক্ত জায়গা পায় সেখানে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে এই ট্রান্সফারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে অধিকাংশ ট্রান্সফার স্টেশনে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ থাকে না বিধায় পরিবেশ দূষণ এবং জনগণের দুর্ভোগের কারণ হয়।

বর্জ্যের পরিমাণ

বাংলাদেশ আয়তনের বিবেচনায় পৃথিবীর ৯৫তম দেশ হলেও লোকসংখ্যায় পৃথিবীর ৯ম বৃহত্তম দেশ। নগরায়ন, মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নত জীবনযাপন বর্ধিত বর্জ্য ও বর্জ্যের জটিলতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে ২০১৮ সালের আরবান জনসংখ্যা ছিল ৫৯.১ মিলিয়ন যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ। সেই হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের আরবান সেন্টারের লোকসংখ্যা, মাথাপিছু বর্জ্যের সৃষ্টি এবং শহর ও নগরের প্রকারভেদে বর্জ্যের পরিমাণ নিরূপণ করে চিত্র নং- ২-এ দেয়া হল।

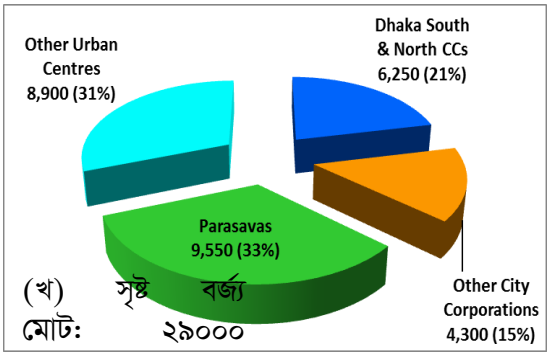

চিত্র নং-২: বাংলাদেশে আরবান সেন্টারের (ক) জনসংখ্যা ও (খ) সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ

এই হিসাবে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রতিদিন মোট ২৯,০০০ টন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। ওয়েস্ট কনসার্নের প্রজেকসন অনুযায়ী ২০২৫ সালে বাংলাদেশে প্রতিদিন ৩৭,০৬৪ টন বর্জ্য সৃষ্টি হবে। এই বর্জ ল্যান্ডফিল পদ্ধতিতে অপসারণ করতে প্রতিবছর ২০০ একর জমির প্রয়োজন হবে।

পরিবহন

সিটি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাস্টবিন থেকে নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবহনের মাধ্যমে চূড়ান্ত ডিসপোজাল সাইটে নিয়ে ডিসপোজ করা। একটি সমীক্ষামতে শহর ও নগরের প্রকারভেদে ৩৭-৭৭ শতাংশ এবং গড়ে ৫৫ শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্থানে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ল্যান্ডফিল করা হয়। অসংগৃহীত বর্জ্য নিয়মানুগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাইরে চলে যায়। এই বর্জ্যের একটি অংশ পুনঃব্যবহার ও রিসাইকেল হয়। একটি অংশ সুয়ার বা ড্রেনেজ লাইনে স্থান পায়। অধিকাংশ অসংগৃহীত বর্জ্য নিচু এলাকা, খাল, নদীভরাট কাজে ব্যবহৃত হয়। সুয়ার লাইন ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের খাল আবর্জনায় বন্ধ হলে জলাবদ্ধতার কারণ হয় এবং নগরজীবনে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে। অসংগৃহীত জৈব বর্জ্য বাংলাদেশে উষ্ণ আবহাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে পচন ধরে ও আশেপাশে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও পরিবেশ দূষণের 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে এই অসংগৃহীত এই বর্জ্য খাল ও নদীদখলে প্রধান ভূমিকা রেখে আসছে।

২০১২ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের হিসাবমতে সিটি কর্পোরেশন ৫১% বর্জ্য সংগ্রহ করে, ২৬% বাড়ির পিছনে ও নিচু জায়গা ভরাট করতে ব্যবহার হয়, ১১% রাস্তার পাশে ও ড্রেনেজ লাইনে যায় এবং ৯% বর্জ্য সংগ্রহকারীরা রিসাইকেল করে এর ৩% বর্জ্য বাড়ি থেকে হকারের কাছে বিক্রি হয়। এই হিসাবে সর্বমোট ১২% বর্জ্য রিসাইকেল হয় অথচ ইউরোপিয়ান দেশসমূহে ২৫-৩৫ শতাংশ বর্জ্য রি-ইউজ ও রিসাইকেল হয়। পরিবহনের জন্য বিভিন্ন রকমের ট্রাক, ট্রাক্টর ট্রেলর ব্যবহার করা হয়। উন্মুক্ত ট্রাকে অতিরিক্ত বর্জ্য বহন করায় অনেক সময় বর্জ্য রাস্তায় পড়ে রাস্তার পরিবেশ নষ্ট করে। অনিয়মিত ও অসম্পূর্ণ বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন অনেক ক্ষেত্রে শহর বা নগরের পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণ হয়।

ডিসপোজাল

বর্জ্যের চূড়ান্ত ডিডসপোজালের জন্য সাধারণত ৩টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

- ল্যান্ডফিলিং
- রিসাইক্লিং ও কমপোস্টিং
- বর্জ্য থেকে এনার্জি উৎপাদন

বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ বর্জ্য ল্যান্ডফিলিং পদ্ধতিতে অপসারণ করা হয়, ১৯ শতাংশ রিসাইকেল হয় এবং ১১ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় দহন করে উৎপাদিত শক্তি ব্যবহার করা হয়। অনুন্নত দেশে উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল ও উন্নত দেশে স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ল্যান্ডফিলিং

বাংলাদেশে বর্জ্য উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল পদ্ধতিতে চূড়ান্তভাবে ডিসপোজ করা হয়। অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গা বর্জ্য দিয়ে ভরাট করাই এই পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণের প্রধান উদ্দেশ্য। ঢাকা ও অন্যান্য শহরের অনেক নিচু জায়গা বর্জ্য ফেলে ভরাট করে ব্যবহার-উপযোগী করা হয়েছে। উল্লেখ্য ঢাকা নগরের যাত্রাবাড়ী ও গাবতলী বাস টারমিনাল দুটি ঢাকা নগরের বর্জ্য ফেলে তার উপর স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে ফেলা হচ্ছে। এই উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল পদ্ধতি

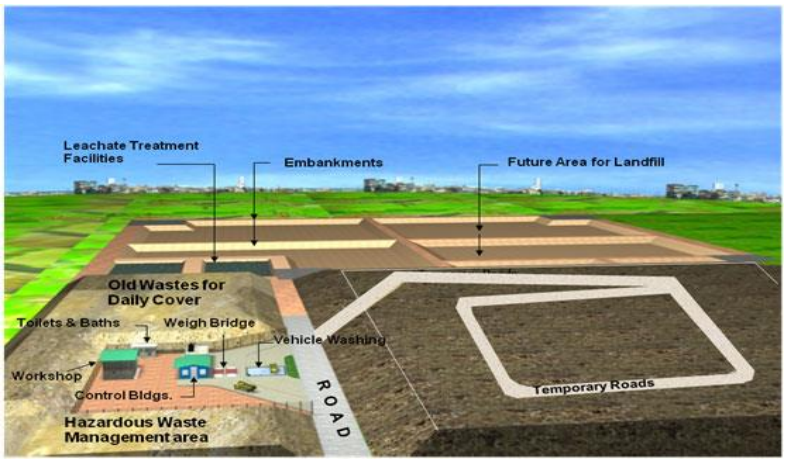

চিত্র নং-২: মাতুয়াইল ফেজ-১-এ "ইঞ্জিনিয়ারড ল্যান্ডফিল"

মোটেই পরিবেশসম্মত নয়। বর্জ্য উন্মুক্ত থাকায় আশেপাশে এর দূষণ ও গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং একটা দুঃসহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি আমিনবাজার ল্যান্ডফিল ঐ এলাকার পরিবেশের হুমকি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল ঐ এলাকার মাটি এবং ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে। বৃষ্টি ও বন্যার পানি এবং বর্জ্য মিশে অত্যন্ত দূষণ ক্ষমতাসম্পন্ন তরল পদার্থ (লিচেট) তৈরি হয়। এই লিচেট চুইয়ে ভূপৃষ্ঠের পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। লিচেট ল্যান্ডফিল থেকে বের হতে বাধাপ্রাপ্ত হলে আস্তে আস্তে মাটির স্তর ভেদ করে ভূগর্ভস্থ পানির সাথে মিশে মারত্মক দূষণ সৃষ্টি করে এবং এই দূষিত পানি বহু বছর দূষিতই থেকে যায়।

ঢাকার মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল ফেজ-১-কে জাইকার আর্থিক ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে একটি 'ইঞ্জিনিয়ারড ল্যান্ডফিলে' উন্নীত করা হয়। স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে এনঅ্যারোবিক পদ্ধতিতে বর্জ্যের জৈব অনু ভেঙে প্রধানত মিথেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় এবং এই গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। মিথেন কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে প্রায় ৩৪ গুণ বেশি বিশ্ব উষ্ণতায় সক্ষমতার জন্য বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তনে মিথেন সক্রিয় ভূমিকা রাখে। মাতুয়াইলে নতুন পদ্ধতিতে একটি পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বর্জ্যের নিচে বাতাস সঞ্চালন করে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। একইসাথে এই পাইপ বর্জ্যের নিচে জমা হওয়া লিচেট পরিবহন করে পরিশোধনের জন্য লিচেট পন্ডে (পুকুরে) জমা করে। বর্জ্যের মধ্যে বাতাস সরবরাহের জন্য সেমিঅ্যারোবিক অবস্থা বিরাজমান থাকে এবং বর্জ্যের মধ্যে মিথেনের পরিবর্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভেনটিলেশন পাইপের মাধ্যমে বাতাসে মিশে যায়। লিচেট যেহেতু বর্জ্যের মধ্যে জমা থাকে না, কাজেই তা বর্জ্যের নিচে মাটিতে প্রবেশ করে মাটি ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত করতে পারে না। ডিজাইন মতে বর্জ্য ফেলা শেষ হলে, পাইপের বাতাস প্রবেশের মুখ বন্ধ করে ল্যান্ডফিলে এনঅ্যারোবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ভেনটিলেশন পাইপ সংযোগ করে মিথেন সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা। সর্বশেষে এই ল্যান্ডফিলকে বনায়ন করে একটা উচ্চ বনভূমি/পার্ক সৃষ্টি করা। মাতুয়াইল ফেইজ- ১-এ এই নতুন পদ্ধতি

প্রয়োগ করা হয় এবং অনেক দেশের মিউনিসিপ্যাল কর্মকর্তা এই পদ্ধতি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মাতুয়াইল ফেইজ-১-এর এই পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত করেনি এবং বর্তমানে ফেইজ-২-এ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করছে বলে মনে হয় না। উন্মুক্ত বর্জ্য ডাম্পিংই অনেক সহজ এবং এই পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশনের অনেক পছন্দ বলে মনে হয়।

রিসাইক্লিং ও কমপোস্টিং

সারা পৃথিবীতে বর্জ্য রিডিউস, রি-ইউজ ও রিসাইক্লিং (৩ আর)-এর ওপর বর্তমানে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। বর্জ্যের পরিমাণ কমানো, বর্জ্যের পুনঃব্যবহার ও রিসাইক্লিং সম্পদ কনজারভেশনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় '৩ আর'-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বাস্তবায়নের জন্য একটা স্ট্রাটেজি পেপার তৈরি করেছে। বাংলাদেশ অসংগঠিতভাবে বর্জ্যের পুনঃব্যবহার ও রিসাইক্লিং হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে মূল্যবান দ্রব্যাদি বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাদা সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয়। চিত্র-১ অনুসারে মাত্র ২২.৫৬% বর্জ্য সংগ্রহকারী বাজার ও ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে সরাসরি রিসাইকেল করা যায়। বর্জ্যের মধ্যে থেকে যা কিছু বাজারে বিক্রি করা যায় যেমন কাগজ, পুরনো অ্যালুমিনিয়াম/মেটাল, অব্যবহৃত কাপড় ইত্যাদি বাসায় আলাদা করে রাখা হয় এবং এসব বর্জ্য ভাঙারির দোকানে অথবা হকারের কাছে বিক্রি করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাসা থেকে বর্জ্য সংগ্রহের সময় ছেঁড়া কাগজ, ভালো প্লাস্টিক, বোর্ড, গ্লাস, ইত্যাদি বর্জ্য থেকে আলাদা করে প্রত্যেক বর্জ্য সংগ্রহকারী গাড়ির সঙ্গে রক্ষিত বড় বড় ব্যাগে আলাদা করে ভরে রাখে এবং বাজারে বিক্রি করে। এটা বর্জ্য সংগ্রহকারীদের অতিরিক্ত আয়। তৃতীয় পর্যায়ে কিছু টোকাই ট্রান্সফার স্টেশনে বর্জ্য থেকে বিক্রয়যোগ্য মালামাল সংগ্রহ করে এবং সর্বশেষে অনেক বর্জ্য সংগ্রকারী প্রত্যেক ল্যান্ডফিল থেকে অবশিষ্ট বিক্রয়যোগ্য মালামাল সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। শেষ পর্যন্ত ল্যান্ডফিলে জায়গা পায় পচনশীল জৈব ও ব্যবহারের অযোগ্য অজৈব বর্জ্য। বর্জ্য থেকে সংগৃহীত মালামাল কেনা-বেচা, প্রসেসিং, নতুন মালামাল তৈরির জন্য অনেক দোকান ও কারখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়া বর্জ্য রিসাইক্লিং-এর সার্ভিস প্রদানের জন্য বাংলাদেশে এখান ২৫টি দেশি-বিদেশি কোম্পানি কাজ করছে।

রিসাইক্লিং ও কমপোস্টিং-এর মাধ্যমে পুরো বর্জ্যকে পুনঃব্যবহারের যোগ্য করা যায় বলে এ পদ্ধতিকে "শূন্য বর্জ্য" পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

জৈববর্জ্য থেকে অ্যারোবিক অথবা এনঅ্যারোবিক পদ্ধতিতে কমপোস্ট তৈরি করা যায়। এই দুই পদ্ধতিতেই কার্বন ক্রেডিটের আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। তবে কমপোস্ট বিক্রির জন্য সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কমপোস্টে বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ যাচাই করে এই অনুমোদন দেয়া হয়। বাংলাদেশে কমপোস্টের কাঙ্ক্ষিত বাজার সৃষ্টি হয়নি। তাই কোনো কমপোস্টিং প্লান্ট আর্থিক বিবেচনায় টেকসই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। কমপোস্টের ব্যবহারের জন্য কৃষি বিভাগের সহযোগিতা ও কমপোস্টের গুণাগুণ সম্পর্কে কৃষকের সচেতনতা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্জ্য ও ফেকাল স্লাজ একসাথে কমপোস্টিং-এর মাধ্যমে উন্নতর কমপোস্ট তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য ও ফেকাল স্লাজ ব্যবস্থাপনা এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই পদ্ধতিতে বর্জ্য ও ফেকাল স্লাজ একসাথে পরিশোধন করলে দ্বিমুখী সুবিধা পাওয়া যায়। ছোট শহরগুলোতে এই পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

বর্জ্য থেকে এনার্জি

বর্জ্য থেকে এনার্জি উৎপাদনের অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। ল্যান্ডফিল থেকে মিথেন গ্যাস সংগ্রহ করে জ্বালনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্জ্য থেকে কমপোস্টিং পদ্ধতিতে বায়োগ্যাস সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া ইনসিনারেশন, পাইরোলাইসিস গ্যাসিফিকশন ও আর্ক প্লাজমা পদ্ধতিতে বর্জ্য থেকে তাপশক্তি সংগ্রহ করে প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

বর্জ্য থেকে এনার্জি সংগ্রহ ও ব্যবহারের সবচেয়ে সহজ উপায় ল্যান্ডফিল থেকে বায়োগ্যাস সংগ্রহ করা। পৃথিবীর বহু দেশে এই পদ্ধতিতে বায়োগ্যাস সংগ্রহ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করলেও বাংলাদেশ এই পর্যন্ত কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশে প্রতিটন বর্জ্য থেকে ৬০-৮০ ঘনমিটার মিথেন গ্যাস সংগ্রহ করা যায় এবং বায়ুমণ্ডলে অর্ধটন কার্বন নিঃসরণ কম হয়। বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস বা ইনসিনারেশনের মাধ্যমে এনার্জি সংগ্রহ করে তা ব্যবহার অথবা বর্জ্যকে কমপোস্টে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করলে কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় সিডিএম (ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম) মাধ্যমে যে সিইআর (সার্টিফাইড ইমিশান রিডাকসান) হয়, তা উন্নত বিশ্বের কার্বনের বাজার দরে বিক্রি করা যায়। বর্তমানে এই কার্বন ব্যবসার ৫২ শতাংশ চীন, ১৬ শতাংশ ভারত এবং ৭ শতাংশ ব্রাজিলের দখলে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা করতে পারেনি। একমাত্র ওয়েস্ট কনসার্ন, নেদারল্যান্ডের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিসাইকেলিং (ডব্লিউ ডব্লিউ আর)-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ৭০০ টন ক্যাপাসিটির একটি কমপোস্টিং প্লান্ট, এই ফান্ডের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ওয়েস্ট কনসার্ন ও ডব্লিউ ডব্লিউ আর ঢাকার মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল থেকে বায়োগ্যাস সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্প তৈরি করে। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর প্রত্যেক জেলায় ল্যান্ডফিল তৈরি করে গ্যাস সংগ্রহ এবং তা ব্যবহারের জন্য প্রকল্প তৈরি করে। কিন্তু সিডিএম-এর আর্থিক সহযোগিতার জন্য তৈরি করা প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হয়নি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কার্বন ট্রেডিং-এর সবচেয়ে বড় বাজার। কার্বন বাজারে বিক্রয়দামে ধংস নামায় উন্নয়নশীল দেশে সম্ভাব্য কার্বন রিডাকসন প্রকল্পগুলো নিরুৎসাহিত হচ্ছে। প্রতি টন কার্বন ২০০৮ সালে বাজারদর ছিল ২০ ডলার, বর্তমানে কার্বনের দাম ৩ ডলারের নিচে নেমে আসায় কার্বন রিডাকশন প্রকল্প আর্থিক বিবেচনা লাভজনক হচ্ছে না। তবে দেশের পরিবেশ রক্ষায় এই পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

ঢাকা সিটিতে দুই সিটি কর্পোরেশন ২০১৩ সনে বর্জ্য ব্যবহার করে দুইটি পাওয়ার প্লান্ট তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। ইটালির এক কোম্পানিকে কার্যাদেশ দেয়ার পর এই প্লান্ট দুইটির নির্মাণকাজ আর এগোয়নি। বর্জ্যের ইনসিনারেশনের জন্য প্রতি কেজি বর্জ্যে সর্বনিম্ন ৪ মেগাজুল তাপশক্তি প্রয়োজন হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বর্জ্যে সর্বনিম্ন তাপশক্তির পরিমাণ প্রতি কেজিতে যথাক্রমে ৬.৩২ মেগাজুল ও ৮.৪৪ মেগাজুল। বাংলাদেশের বর্জ্য বৃষ্টির সময় ভেজা থাকায় ইনসিনারেশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অতিরিক্ত এনার্জি পাওয়া যায় না।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সম্প্রতি বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহ প্রকাশ করায় অনেক সাড়া পাওয়া যায়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২টি দেশি ও ১৫টি বিদেশি কোম্পানি আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এর মধ্য থেকে ১টি দেশি ও ৩টি বিদেশি কোম্পানিকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে ঢাকা ও চিটাগাং সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য থেকে লাভজনকভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। অন্যদিকে ইউএনডিপি অর্থায়নে ৭টি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর একটা সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে এসব পৌরসভার বর্জ্যে অত্যধিক আর্দ্রতা থাকায় ইনসিনারেশনের উপযোগী নয়। বর্জ্যের পানি বাষ্পায়িত করতে অনেক এনার্জির প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভেজা বর্জ্য ইনসিনারেশনের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত এনার্জি পাওয়া যায় না বরং নির্ধারিত তাপমাত্রায় পোড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ফুয়েল প্রয়োজন হয়।

বর্জ্য ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে গ্যাসের সাথে ডাই-অক্সিন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হেভি-মেটাল ও ডাস্ট নির্গত হয়। নির্গত গ্যাস বাতাসে নিঃসরণের আগে দূষণমুক্ত করতে স্ক্রুবার ও ফিলটার দ্বারা গ্যাস পরিশোধনের প্রয়োজন। কিছু গ্যাস উচ্চ তাপমাত্রায় দহন না করলে দূষণমুক্ত হয় না। যথাযথ পরিশোধন না করলে ইনসিনারেটর থেকে নির্গত গ্যাস বায়ুদূষণ করে এবং আশেপাশে বসবাসকারী জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়।

উপসংহারঃ

বাংলদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মোটেই সন্তোষজনক নয়। উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল পদ্ধতি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। স্যানিটারি ল্যান্ডফিল তুলনামূলকভাবে সহজ ও কম ব্যয়বহুল। স্যানিটারি ল্যান্ডফিল থেকে মিথেন গ্যাস সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে এবং এই পদ্ধতিতে সাশ্রয়ী কার্বন বিক্রি করতে পারলে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। জৈববর্জ্য থেকে কমপোস্ট তৈরিতে একই রকম আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। তবে কমপোস্ট বিক্রির অনুমোদনে জটিলতা ও কাঙ্ক্ষিত বাজার সৃষ্টি না হওয়ায় পদ্ধতিটি আর্থিক দিক বিবেচনায় টেকসই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। বাংলাদেশে বর্জ্য ও ফেকাল স্লাজ একসাথে কমপোস্টিং-এর মাধ্যমে উন্নতর কমপোস্ট তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বর্জ্য ও ফেকাল স্লাজ পরিশোধনের জন্য দ্বিমুখী সুবিধা পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মতো সিটি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি 'ডোর টু ডোর' বর্জ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করলে অর্থিক সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। বর্জ্য সংগ্রহের ফি থেকে সিটি কর্পোরেশন/ মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আর্থিক ক্ষমতা বাড়বে। অন্যদিকে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনে সমন্বয় হলে রাস্তায় বা ট্রান্সফার স্টেশনে বর্জ্য পড়ে থাকবে না। বিশ্বে বাসযোগ্য সিটি র‍্যাংকিং-এ ঢাকার অবস্থান প্রায় সর্বনিম্নে। বাংলাদেশের সিটিগুলো বাসযোগ করার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

[লেখক: ইমেরিটাস প্রফেসর, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। ই-মেইল : ferozeahmed45@gmail.com]

বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

আ ব দু ল আ উ য়া ল

প্রথম কথা হচ্ছে, বর্জ্য বলতে আমরা কী বুঝব! পুরো বাংলাদেশের কথা যদি ধরা হয়, কিংবা বিশেষ করে ঢাকা শহরের কথা যদি ধরা হয়, সেই প্রেক্ষাপটে প্রথমে আমরা গৃহস্থালি বর্জ্যের কথা বলতে পারি। এর বাইরে আরও হতে পারে যেমন মনুষ্য-বর্জ্য, যেটার সম্পর্কযুক্ত স্যুয়ারাজের সঙ্গে। আরও হতে পারে যেমন কলকারখানার বর্জ্য, ই-বর্জ্য ইত্যাদি। এসব বর্জ্য খুবই ভয়াবহ। আরেকটা বর্জ্য হল পারমানবিক বর্জ্য, যেটা আরও ভয়াবহ।

যা হোক, এখন কথা হল, প্রথমেই যদি গৃহস্থালি বর্জ্যের কথায় আসি– এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা কী বুঝব! কোনো কোনো দেশে আমি দেখেছি, সেখানে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনাকে অনেক গুরুত্বের সঙ্গে তারা নিয়েছে। সেসব দেশে দেখেছি, বসতবাড়ি থেকেই বর্জ্য কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে চারটি কন্টেইনারে চার রকম বর্জ্য ফেলা হয়। যেমন একটার মধ্যে কাচের দ্রব্যাদি, আরেকটির মধ্যে ধাতব দ্রব্যাদি, আরেকটির মধ্যে কাগজজাত দ্রব্যাদি এবং আরেকটির মধ্যে পচনশীল দ্রব্যাদি ফেলা হয়। একই দৃশ্য দেখেছি সেসব দেশের রেল-স্টেশন, বাসস্টপ, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও।

এর ফলে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যকে আলাদা করবার ঝামেলা থাকে না। এতে করে কাচের অংশটি কাচের কারখানায়, ধাতব দ্রব্যাদি ধাতব কারখানায়, কাগজের অংশটি পেপার মিলে এবং পচনশীল অংশটি জৈবসার তৈরির কারখানায় কিংবা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সহজেই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে আমরা সকল ধরনের বর্জ্য একই কন্টেইনারে ফেলে থাকি। যে দিকটিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যেমন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, একইভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যেও সেই সচেতনতা জন্ম নেয়নি।

কিন্তু এরকম একটি সংস্কৃতি সমাজে না থাকার কারণে কিংবা আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে, সেটি অপূরণীয় পর্যায়ের। যে ডোবা বা নিচু জায়গায় একসঙ্গে সব ধরনের বর্জ্য নিয়ে ফেলা হচ্ছে, সেই জায়গাটি কাচ-প্লাস্টিক-ধাতব দ্রব্যাদির কারণে নানামুখী ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে, একইভাবে এইসব বর্জ্যকে রিসাইকেল বা প্রক্রিয়াজাত পন্থায় অনেক দরকারি দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যেত, সেখান থেকে দেশটি বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ সার্বিক এই কাজটি বাংলাদেশেও বাস্তব রূপ দেয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ধরা যাক, মনুষ্য-বর্জ্যের কথা। এই বর্জ্যটি অনেক দেশেই রিসাইকেল বা প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে একটা অংশ ব্যবহারযোগ্য-পানি তৈরি হচ্ছে, আরেকটা অংশ দিয়ে জৈবসার ও গ্যাস তৈরি হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে, বসতবাড়ির মলমূত্র গিয়ে পড়ছে নদীতে, তাতে নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ছে, জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লঞ্চ-স্টিমার কিংবা রেলযাত্রীদের মলমূত্রও নদী ও পথে-ঘাটে নির্গত হচ্ছে। এতেও চরমভাবে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। যে সমস্যাটি অতি সহজেই আমরা সমাধান করতে পারি। লঞ্চ-

স্টিমার বা রেল কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। বাহনটিতে টেম্পোরারি বক্স বসিয়ে দিলেই হয়। গন্তব্যে পৌঁছার পর পূর্বে লাগিয়ে দেয়া বর্জ্যের বক্সটি খুলে নিয়ে আরেকটি খালি বক্স লাগিয়ে দেয়ার মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হল মেডিকেল বর্জ্য ও ই-বর্জ্য। দুটি ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের অনেক বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে। যে বর্জ্যগুলো ফেলা হচ্ছে যেখানে-সেখানে। এই ধরনের বর্জ্য সংগ্রহের বিশেষ কোনো ব্যবস্থাপনা আজ অব্দি আমাদের দেশে করা হয়নি। অথচ প্লাস্টিকের এই বর্জ্য সংগ্রহ করে সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে নতুন পণ্য তৈরি করা কোনো কঠিন কাজ নয়। শুধু ব্যবস্থাপনার অভাবে এই বর্জ্যও আমাদের জন্য আরেকটি অভিশাপ বয়ে আনছে দিন দিন।

হয়তো আমাদের সকল শুভবুদ্ধির উদয় হবে একদিন। কিন্তু সেই দিন কতটা দূরে সেটা আমাদের জানা নেই।

সে কারণে চলমান বাস্তবতায় যদি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করতে বলা হয়, তাহলে সেই সমস্যা আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে যতোটা রয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি রয়েছে আমাদের আইন-কানুন প্রণয়নে এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে। আমাদের আইন নেহায়েত কম নেই। সমস্যা হল সেই আইন বাস্তবায়ন করবে কে বা কারা! যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তিনি নিজেই সবার আগে ভঙ্গ করে বসেন সে আইন। যার পেছনের কারণটি হল নির্দিষ্ট পদে সঠিক যোগ্য মানুষটিকে না বসানো। এতে করে ওই ব্যক্তি নিজে যেমন দায়িত্ব পালন করে স্বস্তি পান না, একইভাবে এই রাষ্ট্র, সমাজ তথা জনগণও যথাযথ সেবা থেকে বঞ্চিত হন।

অন্য অনেক বিভাগের তুলনায় অবশ্য বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য বড় উদ্যোগ দেখা যায়নি। মানুষের ব্যবহার্য জীবনে পণ্য ব্যবহারের পরই বর্জ্য অপসারণ, নিষ্কাশন তথা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি চলে আসে। কিন্তু দুঃখজনক হল, সেই বিষয়ে বড় কোনো পদক্ষেপ কিংবা কার্যকর কোনো উদ্যোগ ও বাজেট বরাদ্দের সংবাদ আমরা এ পর্যন্ত পাইনি। বরং বেসরকারি পর্যায়ে যারা এই খাতে অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছেন, তাদেরকে সরকারিভাবে সহযোগিতা করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ সরকারের উচিত এই খাতে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং বেসরকারি যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই খাতে অর্থ লগ্নী করতে আগ্রহী হন, তাঁদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা।

মানুষের জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা– এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যেমন জরুরি বিষয়, একইভাবে এই পাঁচ মৌলিক চাহিদাসহ আরও নানা চাহিদা পূরণের মধ্যদিয়ে তৈরি হয় বর্জ্য। সুতরাং এই বর্জ্যকে গুরুত্ব না দেয়ার বা কম গুরুত্ব দেয়ার অর্থ হল ওই পাঁচ মৌলিক চাহিদাকেই গুরুত্ব না দেয়া। সেখানে জীবনের সৌন্দর্য নিহিত কেবল অভাব পূরণের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং চাহিদা পূরণের সঙ্গে যে নির্গত বা উৎপন্ন বর্জ্য-র প্রসঙ্গটি রয়েছে, তাকে একটি যৌক্তিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসার অর্থ হল জীবনের ভোগ বা গ্রহণের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আমাদের জাতীয় জীবনে বহুরকম হতাশা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সেই সীমাহীন হতাশার মাঝে ও আশায় আবার বুক বাঁধি। ফলে ধীর গতিতে হলেও আমাদের রাষ্ট্র এবং সাধারণ মানুষ এক সুন্দর জীবনের স্বার্থে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তরিক ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে, সেটিই সবার কাম্য।

[লেখক: প্রবন্ধ/নিবন্ধকার ও সমাজসেবক। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।]

বাংলাদেশে বর্জ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

তানভীরুল হক প্রবাল

প্রথমে আমাদের পরিষ্কার হতে হবে, বর্জ্য বলতে আমরা কী বুঝব। আমরা দেখব, গৃহস্থালি থেকে দুই ধরনের বর্জ্য হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে এক ধরনের বর্জ্য, ঘর ঝাড়া-মোছার মাধ্যমে ধুলা-ময়লা-ছেঁড়া কাগজ-মাকড়ের জাল ইত্যাদি থেকে হয়, আরেক ধরনের বর্জ্য রান্না-বান্নার সবজি-মাছ-মাংস কাটা-কুটি থেকে তৈরি হয়।

আরেক ধরনের বর্জ্য তৈরি হয় হাসপাতাল থেকে। সেখানে রোগীর জন্য ব্যবহৃত স্যালাইন বক্স, ওষুধের খোসা, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি থেকে খুব বাজে ধরনের বর্জ্য তৈরি হয়। একটি বড় হাসপাতাল থেকে প্রতিদিন ব্যাপক পরিমাণে বর্জ্য তৈরি হয়। এরকম একেকটি শহরে কত হাসপাতাল থাকে এবং সেখান থেকে মোট কত হাসপাতাল-বর্জ্য তৈরি হচ্ছে, সেটি আমাদের অনেকের চিন্তারও বাইরে।

আরেক ধরনের বর্জ্য কারখানা থেকে তৈরি হয়। সে ক্ষেত্রে এক ধরনের কারখানা রয়েছে, যেখান থেকে **ইটিপি**-র মাধ্যমে বর্জ্য তৈরি হয়, আবার অনেক কারখানা রয়েছে যেখানে **ইটিপি** দরকার হয় না! সেসব কারখানা থেকে হয়তো হালকা ধরনের বর্জ্য তৈরি হয়।

কারখানা যেমন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, সেগুলোর বর্জ্যও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন ওষুধ শিল্প-কারখানার বর্জ্য এক ধরনের, গার্মেন্টস শিল্পের এক ধরনের বর্জ্য আবার ট্যানারির আরেক ধরনের বর্জ্য। অর্থাৎ বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

এখন এই বর্জ্য একটা বিশাল জগৎ, ফলে এর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাপনার দরকার রয়েছে। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে বর্জ্য মন্ত্রণালয় থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি আলাদা মন্ত্রণালয় দরকার নেই, বরং ঠিকঠাক মতো কাজ হলে, সেখানে সিটি কর্পোরেশনই যথেষ্ট। এমনকি গ্রামের বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকারই এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারে বা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে করেও থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হল, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলেই এই ব্যবস্থাপনা সহজ হতে পারে। আমি বিভিন্ন দেশে দেখেছি, সেখানকার মানুষজন তাদের আচরণের মধ্যেই এমনভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিয়েছে যে, বর্জ্য কোথায় কীভাবে কখন ফেলতে হবে সেটি আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে সেখানকার রাষ্ট্রীয় যে সকল ব্যবস্থাপনার উপায় রয়েছে, সেগুলোও যথোপযুক্তভাবে কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হল, এখানকার মানুষজন বর্জ্যকে কীভাবে কোথায় ফেলবে বা ফেলতে হবে বা ফেলা উচিত– সে ব্যাপারে এখনো উদাসীন। সে কারণে সরকার কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সেগুলো ফলপ্রসূ হয় না। এটা হল মানুষের আচরণগত সমস্যা, যা দীর্ঘকাল বসে তৈরি হয়। সেই আচরণ তৈরির জন্যই আমি মনে করি সবচেয়ে বেশি কাজ করবার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ যতদিন-না সচেতন হবে, ততো দিন যত উদ্যোগই নেয়া হোক-না কেন,

সেটা ভালো ফল দেবে না। সুতরাং বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল, মানুষের মধ্যে নানা উপায়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করতে হবে। সে কাজ হতে পারে সরকারি উদ্যোগে আবার সেটা বেসরকারি উদ্যোগেও হতে পারে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, সেখানকার রেল বা বাসস্টপে কিংবা মার্কেটের সামনে চার-পাঁচটি কন্টেইনার রাখা থাকে, সেগুলোর একটিতে ফেলা হয় কাচের বর্জ্য, আরেকটিতে ফেলা হয় পচনশীল বর্জ্য, আরেকটিতে টিন এবং আরেকটিতে হয়তো কাগজ। এখন সেখানকার মানুষ যদি কন্টেইনারগুলোতে ঠিকমতো বর্জ্য না ফেলত, তাহলে নিশ্চয়ই সেখানেও রাস্তাঘাটে ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকত, দুর্গন্ধ ছড়াত। কিন্তু সেই দেশগুলো এতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে থাকে, সেটা কেবল সরকারের চেষ্টার কারণে নয়; বরং সেখানে একটি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে সংস্কৃতি বাংলাদেশে নেই বলেই সরকারি উদ্যোগগুলোও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না। আমরা জানি, ঢাকা শহরে রাস্তার ধারে অনেক কন্টেইনার দেয়া হয়েছিল ময়লা ফেলার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হাতের কাছে কন্টেইনার থাকা সত্ত্বেও সেখানে ময়লা না ফেলে তার বাইরে নিজেদের ইচ্ছামতো জায়গায় ময়লা ফেলছে। কোথাও কন্টেইনারগুলো চুরিও হয়েছে। এই যখন একটি দেশের সামগ্রিক অবস্থা, সেখানে প্রথম কাজই হওয়া দরকার মানুষকে সচেতন করে তোলা। এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে সঠিক স্থানে ময়লা ফেলতে অভ্যস্ত করে তোলা। সেখানে সরকারি উদ্যোগগুলোও বিষয়টি নিয়ে লেগে থাকার প্রয়োজন অনুধাবন করে না। কন্টেইনারগুলো রাস্তার ধারে বসিয়েই তারা নিজের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে মনে করে। অথচ সেখানে ফলোআপের দরকার ছিল, মানুষগুলো ঠিকমতো কন্টেইনারগুলোতে ময়লা ফেলছে কিনা, সে বিষয়ে নজর রাখা দরকার ছিল, এমনকি কন্টেইনার চুরি যাতে না হয় সে জন্য আলাদা নজরদারি দরকার ছিল। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কন্টেইনারের জন্য হয়তো একটা বরাদ্দ হয়েছে, সেই বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়ে যাওয়ার পরে সেই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আর কোনো মাথাব্যথা নেই বলেই তারা ভেবে নিয়েছে। সুতরাং এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধানের জন্য সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বড় উদ্যোগ নিতে হবে। যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে মানুষকে সচেতন করে তুলবার ব্যাপারে।

যার পাশাপাশি ছোট আকারে হলেও তিরস্কার ও শাস্তির বিধানও রাখা যেতে পারে হয়তো। সারকথা হল, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে সমাধানের চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। তার পরিবর্তে সার্বিক পরিকল্পনা করে ধীরে ধীরে মানুষকে এই অভ্যস্ততার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এবং সেই প্রক্রিয়া হঠাৎ চালু করা কিংবা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার রেওয়াজ থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। বরং কোনো কার্যকরী উদ্যোগ গৃহীত হওয়ার পরে যেন সেটি ধারাবাহিকভাবে বহুদিন ধরে চলতে থাকে। যে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা গেলে, সাধারণ মানুষ কিছুটা নিজেদের তাগিদ থেকে আর কিছুটা তিরস্কার ও শাস্তির ভয়ের কারণে ধীরে ধীরে বর্জ্যকে সঠিক জায়গায় ফেলবে এবং দেশটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উৎসাহী হবে।

[লেখক: প্রবন্ধকার/নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিল্ডিং ফর ফিউচার লি.।]

বর্জ্য নিয়ে কথকতা

ফ রী দু ল আ ল ম

বিভিন্ন উৎস থেকে আসা যেসব পদার্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে না, তাকে বর্জ্য বলে। একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

১) Refuge (রিফিউজ)– ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, কৃষিকার্য ইত্যাদি উৎস থেকে যে বর্জ্য পদার্থ পাওয়া যায় তাকে রিফিউজ বলে।

২) Excreta (এক্সক্রিয়েটা)– মানুষের মলমূত্রকে এক্সক্রিয়েটা বলে।

৩) Sullage (সালেজ)– ঘরবাড়ির বর্জ্য পদার্থ যার ভেতর মলমূত্র থাকে না তাকে সালেজ বলে।

এবারে দেখা যাক বর্জ্য পদার্থের অসুবিধাগুলো কী কী :

ক) বাতাস দূষিত করে এবং রোগ-জীবাণু ছড়ায়

খ) পানিকে দূষিত করে এবং রোগ-জীবাণু ছড়ায়

গ) মশা-মাছির মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ খাবারকে দূষিত করে এবং রোগ-জীবাণু ছড়ায়

ঘ) পরিবেশ নোংরা করে

ঙ) দুর্গন্ধ ছড়ায়

চ) জীবাণুর সংক্রমণে সহায়তা করে

বর্জ্য বা আবর্জনাকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ অপসারণ করাই হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন আবর্জনা সংগ্রহ, স্থানান্তর, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্ত অপসারণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। আর আবর্জনাকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ অপসারণ করা পরিবেশ সুরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। এ লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার বিকল্প নেই। যেকোনো এলাকায় কঠিন ও তরল বর্জ্য নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হয়।

বর্জ্য পদার্থের আধুনিক ও নিরাপদ অপসারণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা দেশের অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। রাজধানী ঢাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা। এসব অবকাঠামোর জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্জ্য নিষ্কাশনের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নেই। ফলে অসংখ্য মানুষের বাসগৃহ থেকে প্রচুর পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য প্রতিদিন এখানে-সেখানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে রাজধানীতে কঠিন বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও সেকেলে। সব বর্জ্য রাস্তার পাশে এখানে-সেখানে স্তূপ করে রাখা হয় এবং তা পচে-গলে বাতাসকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। বর্ষা মৌসুমে বর্জ্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ডাস্টবিন উপচে কঠিন বর্জ্য রাস্তার পাশে ড্রেনে পড়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়।

রাজধানী ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য শহরে খাল, নদীর মতো প্রাকৃতিক জলাধারগুলো শুকিয়ে গেছে অথবা অবৈধ দখলদারদের হাতে চলে গেছে। ফলে তরল বর্জ্যের অপসারণের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ঢাকায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করছে। বাসগৃহ থেকে নিক্ষিপ্ত আবর্জনা ছাড়াও উন্মুক্ত স্থান থেকে বিপুল পরিমাণ কঠিন ও তরল আবর্জনা প্রতিনিয়ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তুলছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্জ্যের তুলনায় ডাস্টবিনের সংখ্যা কম। মানুষের অজ্ঞতা ও অসাবধানতার কারণে ডাস্টবিনগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। ফলে বর্জ্য পদার্থ এখানে-সেখানে পড়ে থাকে।

একটু বেশি বৃষ্টি হলেই রাজধানী ঢাকা, বন্দর-নগরী চট্টগ্রামের অনেক অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। দেশের অন্যান্য শহরের অবস্থাও কম-বেশি প্রায় একই রকম। প্রাকৃতিক পানি-নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে। রাস্তার উপর জমে থাকা আবর্জনায় হুমড়ি খেয়ে পড়া আর খানা-খন্দে-গর্তে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে আমাদের অধিকাংশের প্রতিদিনের পথচলা। শহরগুলোর পানি-নিষ্কাশন, ময়লা-আবর্জনা অপসারণের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরা এইমর্মে দাবি করে থাকেন যে, এই ধরনের ভোগান্তি খুবই সাময়িক। তাঁদের ভাষ্যমতে সাময়িক হলেও এই সমস্যাগুলো আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বিভিন্ন শহরে অপরিকল্পিত বসতি যেমন বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সমন্বয়হীন অবকাঠামো নির্মাণের যজ্ঞ। বেশির ভাগ শহরের পানি-নিষ্কাশনের পথগুলো হয় বে-দখল হয়ে গেছে আর নয়তো অপচনশীল বর্জ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

একটি শহরের সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অনেকাংশে নির্ভর করে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর। যে শহরে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি সেই শহরের পরিচ্ছন্নতা অনেকাংশে নির্ভর করে বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতার ওপর।

আমাদের দেশের শহরগুলোর ময়লা-আবর্জনা অপসারণ গতানুগতিক পদ্ধতি ও গতিতে এখনও দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। লক্ষ করা যায়, আবর্জনা রাখার বড় বড় কনটেইনার রাস্তায় ঢাকনাবিহীন পড়ে আছে। কোথাও কোথাও রাজপথের কিছু অংশে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই যানবাহন ও পথচারী চলাচলে অসুবিধা হয় এবং আবর্জনার দুর্গন্ধে পথচারীদের জীবন অতিষ্ঠ হচ্ছে। ফ্লাইওভারের নিচের জায়গাগুলোর সৌন্দর্য বর্ধনে কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ তো নেই-ই, উপরন্তু সেখানেও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে।

বাসাবাড়ির আশপাশ, রাস্তা-বাজার, জনসমাগমস্থল, ডোবা, বিভিন্ন স্থাপনার আড়াল-আবডালকে ময়লা ফেলার উৎকৃষ্ট জায়গা হিসেবে বেছে নেয়া হচ্ছে। দোকানিরা রাতে দোকান বন্ধ করার সময় যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলে রাখে।

কোনো কোনো কাঁচাবাজারের অবস্থা খুবই করুণ। কাদা-পানি, ময়লার যন্ত্রণায় এসব বাজারে যাওয়া-আসা করাটাই অসম্ভব বলে মনে হয়। যেখানে-সেখানে কফ-থুতু, পান-বিড়ির উচ্ছিষ্টাংশ, ফলমূলের খোসা, ফেলে দেওয়া কাগজ, প্লাস্টিকের পানির বোতল, নির্মাণসামগ্রীর ময়লা-আবর্জনায় আমরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে মনে হয়। দেশের ৮ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্মুক্ত ভাগাড়ে ফেলা প্রতিদিনের বিপুল পরিমাণের হাসপাতাল-বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করছে। স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মেডিকেল বর্জ্য আলাদা না করেই ফেলা হচ্ছে ডাস্টবিনে। নিক্ষিপ্ত বর্জ্য-তালিকায় রয়েছে সুচ, সিরিঞ্জ, রক্ত ও পুঁজযুক্ত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ, মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ, ওষুধের শিশি, ব্যবহৃত স্যালাইন, রক্তের ব্যাগ ও

রাসায়নিক দ্রব্যসহ অনেক ধরনের চিকিৎসাজাত আবর্জনা। এসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পদ্ধতি গড়ে না ওঠায় বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসপাতাল-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা প্ল্যান্ট থাকা জরুরি। রাজশাহী ও ঢাকা ছাড়া অন্য কোনো সিটিতে সে ব্যবস্থা নেই। গৃহস্থালি বর্জ্য, মেটাল, প্লাস্টিক ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য আলাদা করতে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

একটি এলাকার কঠিন, আধা কঠিন ও তরল বর্জ্য-আবর্জনাকে সুষ্ঠুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ অপসারণ সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা বর্জ্য পরিচালন (waste management)। বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন আবর্জনা সংগ্রহ, স্থানান্তর, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্ত অপসারণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। আর বর্জ্য আবর্জনাকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করা হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। কোনো একটি এলাকার জনস্বাস্থ্য, কারিগরি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সফল কার্যকারিতা নির্ভর করে। আঞ্চলিক পরিবেশ এবং এলাকার জনগণের প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে বছরে শহরগুলোতে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয় ২২.৪ মিলিয়ন টন অথবা বছরে মাথাপিছু বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৫০ কেজি। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রতিদিন বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭,০৬৪ টন। দেশের মোট বর্জ্যের ৩৭ ভাগ উৎপাদিত হয় রাজধানী ঢাকায়। অথচ এখানে বর্জ্যের কোনো পরিকল্পিত ব্যবহার নেই। আমাদের দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় বর্জ্য সংগ্রহ করে তা আবর্জনার স্তূপে পাঠিয়ে দেয়া। ইউএনএফপিএ-র মতে, ঢাকা যে সর্বাধিক দূষিত শহরের একটি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এর অন্যতম কারণ।

রাজধানী ঢাকায় মোট বর্জ্যের ৭০ ভাগই সলিড বর্জ্য বলে মনে করা হয়। রাজধানীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন। তরল বা লিকুইড বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে

আছে ঢাকা ওয়াসা। ঢাকায় সর্বমোট ২,৫০০ কিলোমিটার খোলা ড্রেন এবং ৪,০০০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে। এ কাজ করার জন্য ৬৫ কিলোমিটার খোলা খাল ও বক্সকালভার্ট আছে। তরল বর্জ্য সাধারণত এসব ড্রেন ও বক্স কালভার্টের মাধ্যমে অপসারিত হয়।

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে দিনে গড়ে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছয় হাজার টনের বেশি নয় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়।

বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষাও বলছে ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে সাত হাজার মেট্রিক টনের মতো বর্জ্য উৎপাদিত হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকায় প্রতিদিন ৬,১১০ টন গৃহস্থালি বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকার প্রত্যেক নাগরিক ৩৭৭ গ্রাম বর্জ্য উৎপাদন করে, যার ৯৭ শতাংশই জৈব পদার্থ। বাকি তিন শতাংশ বর্জ্য অজৈব। মেডিকেল এবং মেডিকেল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে ১,০৫০ টন ও রাস্তাঘাট থেকে চারশ মেট্রিক টন বর্জ্য তৈরি হয়।

বলা হয়ে থাকে ঢাকায় উৎপাদিত বর্জ্যের ৭৬ ভাগই রিসাইকেলযোগ্য। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পুরোটাই আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়া হয়। ১০ বছর আগে দৈনিক ৩,২০০ টন বর্জ্য উৎপাদনের বিপরীতে ৪৩ শতাংশ হারে অপসারিত হওয়ায় অপসারিত হত ১,৩৭৬ টন।

আর এখন দৈনিক ৬,১১০ টন বর্জ্য উৎপাদনের বিপরীতে অপসারিত হয় ৪,৫৮২ টন বর্জ্য। বৃষ্টিতে পানি জমলে কঠিন এবং তরল বর্জ্য একাকার হয়ে যায়। গত ১০ বছরে ঢাকায় বর্জ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

প্রায় দুই কোটি মানুষের শহর ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বেশ নাজুক। দু'টি সিটি কর্পোরেশন বিপুল সংখ্যক বাসিন্দার প্রতিদিনের বর্জ্য অপসারণে যেমন একশত ভাগ সক্ষম নয়, তেমনি এ শহরের বেশির ভাগ বাসিন্দাই আবর্জনা ফেলার ব্যাপারে অসচেতন এবং উদাসীন দেশের মোট বর্জ্যের ৩৭ ভাগ উৎপাদিত হয় রাজধানী ঢাকায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্জ্যকে জৈব সার উৎপাদনসহ বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে স্যুয়ারেজ ওয়াটারকে পরিশোধনের মাধ্যমে পানযোগ্য বিশুদ্ধ পানিতে পরিণত করা হচ্ছে। আমাদের দেশে ও সীমিত পরিসরে বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে নাজুক করছে এবং এলাকার সৌন্দর্য বিনষ্ট করছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই স্থায়ী-অস্থায়ী, ছোট-বড় যেকোনো ইন্সটলেশনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবেচনায় রাখা হয় সেটি শহরের সৌন্দর্যহানি ঘটাচ্ছে কি-না, জন-মানুষের অসুবিধা হচ্ছে কি-না, পরিবেশের ক্ষতি বা অন্য কোনো জন-উপদ্রব তৈরি করছে কিনা।

কিন্তু আমাদের শহরগুলোতে এগুলোর কোনো কিছুই বিবেচনায় নেয়া হয় না।

রাস্তায় রাস্তায় ময়লা ফেলার লোহার বড় বড় কনটেইনার শহরের সৌন্দর্যহানিসহ মানুষ ও পরিবেশের বহুবিধ সমস্যা গৃষ্টি করছে। কয়েক বছর আগে স্থাপিত শহরময় ফুটপাতের লোহার তৈরি ঝুলন্ত মিনি ওয়েস্ট বিনগুলো শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে কোনো ভূমিকা রেখেছে কি না সেটিও মূল্যায়নের দাবি রাখে।

বড় বড় কনটেইনার সরানোর কোনো উপায় যদি না-ই থাকে, তাহলে এগুলোকে এমনভাবে তৈরি ও স্থাপন করতে হবে, যেন শহরের সৌন্দর্য বর্ধনে অবদান রাখতে পারে এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য কোনো সমস্যা গৃষ্টি না করে।

রাস্তার বিরাট অংশ দখল করে রাখা কিম্ভূতকিমাকার ওই কনটেইনার ও মিনি ওয়েস্টবিনগুলো মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা-ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'অপরিচ্ছন্ন ও অসুন্দর শহর' অপবাদের এ তিলক আমাদের ললাট থেকে সরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

[লেখক: প্রবন্ধকার, নিবন্ধকার]

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

জান্নাতুন নিসা

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) তাঁর ছাড়পত্র কবিতায় লিখেছেন– 'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;/জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ- পিঠে/চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি– নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' সে অঙ্গীকার উপলব্ধি করেই সুকান্তের লেখনীর অনেক আগেই অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ প্রয়োজনের বাইরের অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরিয়ে পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনে ব্যস্ত হয়েছে যারপরনাই। আর কালের বিবর্তনে ব্যবহারে অপ্রয়োজনীয় এই দ্রব্যের নামকরণ হয়ে ওঠেছে আবর্জনা কিংবা বর্জ্য। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি– বিভিন্ন উৎস থেকে আসা যেসব পদার্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে না, তা-ই বর্জ্য। পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত করে সবুজ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে আমাদের কতই-না অন্তহীন প্রচেষ্টা। অথচ বিশ্বময় এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে বৈ ভিন্ন খুব বেশি কিছু হচ্ছে না! আর তাই বিশ্বায়নের এই যুগেও আমরা বিশ্ববাসীর অনেকেই আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সোনার কাঠির সান্নিধ্য পাইনি। কিংবা বলা চলে গা এড়িয়ে চলছি অকপটে। আর গা-এড়ানো অনন্তের হাত ধরে এই পথচলায় পৃথিবী নামক বাসযোগ্য আবাসস্থল পূর্ণ হয়ে উঠছে জরা-ব্যাধির মাধ্যম বর্জ্যে। জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত ২০১০ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, সারাবিশ্বে জনপ্রতি বর্জ্য উৎপাদন হয় গড়ে আটশত গ্রাম করে। সেই হিসাবে ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বের সম্মিলিত মানবসৃষ্ট বর্জ্য উৎপাদন হতে পারে প্রায় ৫.৯ মিলিয়ন টন। এছাড়া এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্লাস্টিকের ভয়াবহতা আরও খারাপ– প্রতিবছর প্রায় ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক আবর্জনা সাগরে গিয়ে পড়ছে। রিপোর্টে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, জরুরিভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে ২০৫০ সালের মধ্যে সাগরে মাছের চেয়ে প্লাস্টিক আবর্জনার পরিমাণই বেশি হবে। প্রশান্ত মহাসাগরের এক প্রান্তে অবস্থিত মিডওয়ে আইল্যান্ডের সৈকতও আজ আবর্জনামুক্ত নয়। আর বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতও সেই ধারাবাহিকতায় হুমকির মুখে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গা সহ দেশের অন্যান্য শহরে খাল-বিল, নদীর মতো প্রাকৃতিক জলাধারগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা অনেকক্ষেত্রেই অবৈধ দখলদারের হাতে চলে গেছে। আর নদীর মিঠা-স্বাদু পানি তার স্বচ্ছতায় পূর্ণ সজীব ইতিহাস হারিয়ে বন্দি হয়ে যাচ্ছে পানি-জাদুঘরে। ভাটিয়ালি গানের সর্বনাশা পদ্মার মতো অনেক নদীর গতিপথ ক্ষীণ হয়ে পরিণত হয়েছে সরু নালায়। দখল, দূষণ আর নদীগর্ভে প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন বর্জ্য জমে মরে যাচ্ছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী। ফলে তরল বর্জ্যের অপসারণের স্বাভাবিক গতি সম্পূর্ণ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা হারাতে বসেছি রং-রূপ-জৌলুসে ভরপুর কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ধানসিঁড়ি নদী, যা এখন মৃতপ্রায়; মাইকেল

মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) ঢেউ খেলানো খরস্রোতা কপোতাক্ষ নদ; অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) তিতাস নদী। এই ভয়াবহতা দূরীকরণের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের প্রক্রিয়া।

সারাবিশ্বে নগর, নগরের সাধারণ অধিবাসী, স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সরকারের জন্য নগর এলাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূল এজেন্ডা হচ্ছে এই বর্জ্য। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খাতে নগর বাজেটে বরাদ্দও থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এই বাস্তবতায়, সব নগর বা পৌরসভার লক্ষ্য হতে পারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে 'বর্জ্য বিচক্ষণ নগরী' হিসেবে নিজেকে রূপান্তর করা। বিশ্বব্যাপী সব সরকার কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিশ্ব দলিল হচ্ছে– যথাক্রমে ১) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals), ২) জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্যারিসের ঐকমত্য (Paris Agreement Climate Change), ৩) নতুন নগর আলোচ্যসূচি কার্যক্রম (New Urban Agenda)। এই তিনটি দলিলের গৃহীত প্রস্তাবনায় নগরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণ বা জৈব বর্জ্যও বাদ যায়নি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১ (**SDG-11**)-এর লক্ষ্য হচ্ছে, 'অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।' **SDG-11**- এর উপধারা **SDG-11**.6-এর লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে– 'বায়ুর গুণাগুণ এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নগরগুলোর মাথাপিছু পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনা।' আলোচ্য লক্ষ্যমাত্রার ওপর কর্মসম্পাদন পরিমাণকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক **SDG-11**.6.1 অনুযায়ী– 'বিভিন্ন নগরভেদে নগর হতে নির্গত কঠিন বর্জ্য নিয়মিত সংগ্রহের হার এবং সংগৃহীত মোট কঠিন বর্জ্য উপযুক্তভাবে নিক্ষেপণের হারের অনুপাত নির্ধারণ করা।'

বাতাস, পানি দূষিত করা, মশা-মাছির মাধ্যমে খাবার দূষিত করা এবং রোগজীবাণু ছড়িয়ে পরিবেশ নোংরা করা, দুর্গন্ধ ছড়ানো, জীবাণুর সংক্রমণে সহায়তা করাসহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে বর্জ্য পদার্থ। তাই এর সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management) বলতে সাধারণত– বর্জ্য বা আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনঃব্যবহার (Recycling) এবং নিষ্কাশনের (Disposal) সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ মানুষের কার্যকলাপে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংক্রান্ত কাজগুলোকে বুঝানো হয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়। বর্জ্য থেকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য, কিংবা পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষার কাজগুলো এই প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া আবর্জনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনা থেকে পরিবেশের ক্ষতি রোধ করার কাজ এবং আবর্জনা থেকে পুনঃব্যবহারযোগ্য বস্তু আহরণ সংক্রান্ত কাজও করা হয়। উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশভেদে, শহর বা গ্রাম্য এলাকাভেদে, আবাসিক বা শিল্প এলাকাভেদে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ধরন আলাদা হয়। সাধারণত স্থানীয় বা পৌরকর্তৃপক্ষ আবাসিক বা প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত নয় এমন বর্জ্যসমূহের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকারও বিষাক্ত নয় এমন বর্জ্যসমূহ ঐ বর্জ্য উৎপন্নকারীদেরকেই ব্যবস্থাপনা করতে হয়। একটি এলাকার কঠিন, আধাকঠিন ও তরল বর্জ্য আবর্জনার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ অপসারণ সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা বর্জ্য পরিচালন (Waste Management)। বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন আবর্জনা সংগ্রহ, স্থানান্তর, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্ত অপসারণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। আর বর্জ্য আবর্জনাকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করা হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়।

এলাকার জনস্বাস্থ্য, কারিগরি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সফল কার্যকারিতা নির্ভর করে। আঞ্চলিক পরিবেশ এবং এলাকার জনগণের প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতিও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার বিকল্প নেই। যে কোনো এলাকায় কঠিন ও তরল বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হয়। কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি শহর-বন্দরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন এবং হেভি-লোডার সরবরাহ করার প্রয়োজন পড়ে। সুন্দর পৃথিবীর জন্যে বর্জ্যকে নিরাপদ স্থানে অপসারণ করতে শহরের দূরবর্তী কোনো স্থান নির্বাচন করে সেখানে বর্জ্যের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কঠিন বর্জ্যকে রিসাইক্লিং করার জন্য আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প হাতে নিতে হবে। তরল বর্জ্য যাতে পরিবেশ-ঝুঁকির কারণ না হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত উন্নত ডিজাইনের সিউয়ার ও উন্মুক্ত ড্রেনলাইন স্থাপনসহ সিউরেজ পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেরও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। বর্জ্য বা অপদ্রব্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকর্তৃক বর্জ্য সংরক্ষণ, নিরপেক্ষায়ন, নিষ্ক্রিয়করণ অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন নতুন জিনিস বানানো উচিত। যেমন– আমরা খবরের কাগজ থেকে ঠোঙা বানিয়ে ব্যবহার করে আসছি বহুকাল ধরে। কিংবা বলা যায় ভেঙে যাওয়া আসবাবপত্র থেকে নতুন কিছু তৈরি করা। এতে যেমন পরিবেশ লাভবান হবে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে দেশের মানুষ।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল ও দশম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ফলে দেশে বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে বেড়ে চলেছে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাও। বর্তমানে বাংলদেশে বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ২২.৪ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ মাথাপিছু ১৫০ কিলোগ্রাম। এ হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সালে দৈনিক প্রায় ৪৭ হাজার ৬৪ টন বর্জ্য উৎপন্ন হবে। এতে করে মাথাপিছু হার বেড়ে দাঁড়াবে ২২০ কিলোগ্রাম। ফলে এখনই প্রয়োজন সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া। ১৯৮০ থেকে ২০১০ সময়কালে বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে শতকরা ৪.৪ ভাগ অথচ গ্রামীণ জনসংখা বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে শতকরা ১.৩ ভাগ। ২০১১ সালে বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যা ছিল ৪.২৭ কোটি (২০১১ সালে মোট জনসংখ্যার ২৮.৩৭%) এবং গ্রামীণ জনসংখ্যা ছিল ১০.৭৮ কোটি (২০১১ সালে মোট জনসংখ্যার ৭১.৬৩%)। অথচ ২০৫০ সালে বাংলাদেশের শহরগুলোতে বাস করবে ১১.২ কোটি (২০৫০ সালে মোট জনসংখ্যার ৫৫.৫৮%) মানুষ এবং গ্রামগুলোতে বাস করবে ৮.৯৫ কোটি মানুষ (২০৫০ সালে মোট জনসংখ্যার ৪৪.৪২%)। অতএব শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কী অবস্থা হবে তার কিছুটা অনুমান এখনই করা যেতে পারে, যদি সঠিক পদক্ষেপ এখনই নেয়া না হয়। সাধারণত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়–

১. রিফিউজ (জবভঁমব)– ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, কৃষিকার্য ইত্যাদি উৎস থেকে যে বর্জ্য পদার্থ পাওয়া যায় তাকে রিফিউজ বলে।
২. এক্সক্রিয়েটা (Excreta)– মানুষের মলমূত্রকে এক্সক্রিয়েটা বলে।
৩. সালেজ (Sullage)– ঘরবাড়ির বর্জ্য পদার্থ যার ভেতর মলমূত্র থাকে না তাকে সালেজ বলে।

সরকারি তথ্যমতে, ঢাকা শহরের প্রতিদিন তৈরি হওয়া বর্জ্যের মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ সিটি কর্পোরেশন দুটি সংগ্রহ করতে পারে। একদিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যেমন খুব ভালো পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি তেমনি বর্জ্য কমানো ও রিসাইক্লিং করার উদ্যোগ তেমন নেই। অন্যান্য শহরগুলোতেও কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতার অভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুরবস্থা চলছে। সংগ্রহ না হওয়া বাকি বর্জ্য (শতকরা ৪০ ভাগ) তাই অবৈধভাবে বাড়ির পাশের খানাখন্দে, ডোবা-নালা, ড্রেনে, রাস্তার পাশে, খোলা জায়গায়, খালে-বিলে, জলাভূমিতে এমনকি নদীতেও ফেলা হয়। বর্জ্যের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি করবে তাই এ বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকেও দুরূহ করে তুলতে পারে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর আইনি ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার যোগান এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অংশীদারদের কার্যকর অংশগ্রহণ জরুরি। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ছোট-বড় শহরগুলোয় মানুষ কঠিন ও আধা-কঠিন আবর্জনা সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে ফেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্জ্যের তুলনায় ডাস্টবিনের সংখ্যাও কম। শুধু রাজধানী ঢাকার সিটি কর্পোরেশন এলাকার কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ ৩ হাজার টনের বেশি। মানুষের অজ্ঞতা ও অসাবধানতার কারণে ডাস্টবিনগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। ফলে বর্জ্য পদার্থ এখানে-সেখানে পড়ে থাকে, বাতাসসহ সার্বিক পরিবেশকে দূষিত করে। বর্ষা মৌসুমে এ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। কঠিন বর্জ্য পদার্থ রাস্তার পাশের ড্রেনে পড়ে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাকে একেবারে অচল করে দেয়। এমনিতেই দেশের বেশিরভাগ স্থানে তরল বর্জ্য অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত সিউয়ার এবং খোলা ড্রেন নেই; ফলে তরল আবর্জনা বা সিউরেজের নিরাপদ অপসারণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ড্রেন উপচে পড়া এবং রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তরল বর্জ্য পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য-ঝুঁকি দিন দিন বৃদ্ধি করে চলেছে। এমনকি পানি ও বায়ুবাহিত নানা রোগ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়ায় রাজধানী ঢাকায় বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা। এসব অবকাঠামোর জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্জ্য নিষ্কাশনের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। ফলে অসংখ্য মানুষের বাসগৃহ থেকে প্রচুর পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য প্রতিদিন এখানে-সেখানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে রাজধানীতে কঠিন বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও সেকেলে। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বর্জ্য পদার্থকে রাস্তার পাশে বা এখানে-সেখানে স্তূপ করে রাখা হয় এবং তা পচে-গলে বাতাসকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। একটি শহরের সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অনেকাংশে নির্ভর করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর। বর্জ্যের অনুপাতে উপযুক্ত সংখ্যক ডাস্টবিন না থাকা এবং জনগণের অভ্যাসগত কারণে ডাস্টবিন উপচে কঠিন বর্জ্য রাস্তার পার্শ্বস্থ ড্রেনে পড়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। ঢাকায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গাদাগাদি করে বসবাস করা অসংখ্য মানুষের বাসগৃহ থেকে বিপুল পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য প্রতিনিয়ত এখানে-সেখানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এ ছাড়া উন্মুক্ত স্থান থেকেও বিপুল পরিমাণ কঠিন ও তরল আবর্জনা প্রতিনিয়ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তুলছে। সভ্য জগতে বাস করার সুবাদে আমরা অনেক কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ সুসম্পন্ন করলেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুব সাধারণ একটি কাজও সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক নই। কারণ আমরা যদি– গর্ত করে বর্জ্য পদার্থ ফেলে গর্তের মুখ চাপা দিয়ে, নিজেদের আওতাধীন বিভিন্ন স্থান থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পরে পুড়িয়ে ফেলি, নিচু স্থানে বর্জ্য পদার্থ ফেলে দীর্ঘদিন রেখে দিয়ে পরবর্তীকালে বর্জ্যকে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করি কিংবা কলকারখানার বর্জ্য পানিতে

না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে জমা রেখে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করে পরে সেগুলো সরিয়ে ফেলি তাহলেও ভয়াবহতার স্বরূপ কিছুটা বন্ধ হবে। কিন্তু আমরা কেউ সাধারণ এই কাজগুলো করতে রাজি নই কিংবা বলা চলে আমাদের মধ্যে আমরা সেই অভ্যাসটা গড়ে তোলার চেষ্টাটাই কখনও করিনি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, আর সেখানে প্রক্রিয়াজাতকরণ কিছুটা কঠিন বৈ কি! তবুও আশার কথা, ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশ– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, 'জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন।' আরও আশার কথা এই যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে একটি ধারা যোগ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজিত নতুন এই ১৮ (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' তাই আমরা আশাবাদী– সংবিধানের আলোকে আমরা সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি আইনি কাঠামো ও কার্যকর কৌশল খুঁজে পাব।

একটি নিরাপদ, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার চর্চা বন্ধ করতে হবে, কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বর্জ্য মানুষের জন্য একটি অন্যতম হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর মানুষ ও পরিবেশের জন্য বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণেই এখন আইন করে নিয়ন্ত্রিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা এবং পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির জন্য বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নতুন নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়বে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পৌর বর্জ্য আসে মূলত গৃহস্থালি বর্জ্য, প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য, বাণিজ্যিক বর্জ্য, রাস্তাঘাটে ফেলা বর্জ্য, কল-কারখানার বর্জ্য এবং বিভিন্ন ধরনের নির্মাণকাজ বা ঘরবাড়ি ভাঙার বর্জ্য থেকে। যদিও বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু ঢাকা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুব ভালো ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এখনও যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার অভ্যাস যায়নি শহরবাসীর কিংবা বর্জ্য সঠিকভাবে ফেলার পদ্ধতিও শহরবাসী বিশেষত বস্তিবাসী খুঁজে পায়নি। এর ফলে ক্রমাগত হারে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রতি হুমকি বাড়ছে। এছাড়াও, শহরে কত পরিমাণ ও কী কী ধরনের বর্জ্য তৈরি হচ্ছে তা সঠিক ও বিস্তারিত গবেষণা তথ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট থাকলেও আর্থিক সঙ্গতি ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা ঘাটতি থাকায় শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা জটিল হয়ে উঠছে। আর সেক্ষেত্রে আবর্জনার প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। যদিও আবর্জনার তেমন শ্রেণিবিন্যাস নেই তবুও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে আবর্জনাকে বিভাজন করা হয়। মূলত বর্জ্য সংগ্রহের সুবিধার্থেই এভাবে শ্রেণি-বিভাগ করা হয়।

১. পৌর এলাকার আবর্জনা
২. বাণিজ্যিক এলাকার আবর্জনা
৩. শিল্প এলাকার আবর্জনা

আবার যেখানে শেষ গন্তব্যস্থল হিসেবে বর্জ্যকে মূলত মাটিচাপা দেয়া হয়, সেখানে শ্রেণিবিভাগটা এরকম–

১. পচনশীল
২. অপচনশীল

যেখানে বর্জ্য পোড়ানো হয় সেখানে শ্রেণিবিভাগ অনেকটা এমন–

১. দহনযোগ্য
২. অদহনীয়
৩. পুনঃব্যবহারযোগ্য
৪. প্লাস্টিক
৫. পুরাতন কাপড়
৬. খবরের কাগজ
৭. পেট-বোতল
৮. কাচের বোতল
৯. ধাতব বস্তু
১০. অতিরিক্ত বড় আবর্জনা
১১. ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যাদি

বাংলাদেশের পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মীরা জড়িত যেমন– বাসাবাড়ি থেকে ভ্যানে করে বর্জ্য সংগ্রহকারী ও নিকটস্থ ডাস্টবিন বা ট্রান্সফার সেন্টারে ফেলার ভ্যানচালক ও তার হেলপারগণ, সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার ঝাড়ুদারগণ, রাস্তার পাশের ডাস্টবিন, খোলা রাস্তার উপর বা ড্রেনে বা যে কোনো স্থানে জমা বর্জ্য সিটি কর্পোরেশনের বা পৌরসভার আবর্জনার ট্রাকে ওঠানো ও তা আবর্জনার স্তূপে নিয়ে ফেলার শ্রমিক, যাদেরকে সিটি কর্পোরেশন স্ক্যাভাঞ্জারস বলে, বর্জ্য পরিবহনের ট্রাকচালক ও হেলপারগণ, রাস্তা-নদীর ঘাট ও ট্রেন স্টেশন, শহরের ডাস্টবিন ও আবর্জনার স্তূপ থেকে নিজের উদ্যোগে আবর্জনার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহকারী বর্জ্যজীবী, ভাঙারি দোকান বা রিসাইক্লিং-এর জন্য তৈরি করার ছোট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বর্জ্যজীবী দিনমজুর (বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী পৃথক করা, ধুয়ে পরিষ্কার করা, যন্ত্রের মাধ্যমে বর্জ্যকে প্রক্রিয়াজাত করা, যেমন– মেশিনে গরু-ছাগল-মহিষের হাড় ভেঙে ছোট টুকরা করা, প্লাস্টিক বোতল কেটে ছোট ছোট টুকরা করা, গাড়ির ব্যাটারির প্লাস্টিক-ধাতব অংশ আলাদা করা, কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আলাদা করা)। একজন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মী সিটি কর্পোরেশনে বা পৌরসভায় চাকরিভুক্ত কর্মচারী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মী স্বাধীন-স্বনিয়োজিত বর্জ্যজীবী ও বর্জ্যজীবী দিনমজুর। তারা বিভিন্ন ডাস্টবিন ও ডাম্পিং সাইট বা ল্যান্ডফিল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ পেশাটি হল শহরের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীদের আয় করার একটি স্বাধীন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা। বর্জ্যজীবীরা সাধারণত উচ্ছিষ্ট খাবার, কাগজ, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির বর্জ্য, টিন ও টিনজাত দ্রব্য, বোতলের কর্ক, ব্রাশ, বলপেন, আইসক্রিমের পট, ভাঙা কাচ, লোহার টুকরা, কাঠ, জুতা-স্যান্ডেল, ব্যবহার করা সিরিঞ্জ, রক্ত ও স্যালাইনের ব্যাগ, প্লাস্টিক বোতল ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য, এক্স-রে প্লেট, পলিথিন, রাবারের সামগ্রী, হাড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। তারা নিজেরাই বিক্রয়যোগ্য ও পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন শ্রেণিতে আলাদা করে ও বিভিন্ন

উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে তা বিক্রয় করে বা নিজেরা ব্যবহার করে। অধিকাংশ বর্জ্যজীবীই দারিদ্র্য, পারিবারিক কলহ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে। আর ডাস্টবিন, শহরের বড় রাস্তাঘাট বা ল্যান্ডফিলের নিকটস্থ বস্তিতে বা শহরে গৃহহীন অবস্থায় বাস করে। প্রতিদিনই তারা কাঁধে একটি বস্তা এবং হাতে একটি আরচা (লোহার দণ্ড যার মাথা বাঁকা) নিয়ে বর্জ্য ঘাঁটাঘাটি করে প্রয়োজনীয় বর্জ্য খুঁজে বের করে। বর্জ্যজীবীদের যাপিত জীবনের চিত্র তুলে ধরে আমাদের কার্টুনিস্ট রনবী এদেরকে 'টোকাই' বলেছেন। বর্জ্য সংগ্রহ করার পর তার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য সেগুলো তারা নানাভাবে পরিষ্কার করে বা কখনো কখনো পানি দিয়ে ধোয়ামোছা করে। বর্জ্য সংগ্রহ করে তা পরিষ্কার করার পরই তারা সেগুলো নিয়ে বর্জ্য বিক্রির দোকানে (ভাঙারি/কাগজ/ঝুট-এর দোকান) আসে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, শহরের শতকরা ১ ভাগ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বর্জ্যজীবী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই হিসেবে বাংলাদেশে আনুমানিক ৪ লক্ষ বর্জ্যজীবী রয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকাতেই প্রায় ১২০,০০০ দরিদ্র মানুষ পুনঃচক্রায়ন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত আছে। ক্ষতিকর ও দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য সংগ্রহ, ঠিক জায়গামতো নিয়ে ফেলা এবং রিসাইক্লিং-এ এসব মানুষদের অবদান অসামান্য। অথচ বর্জ্য সংগ্রহের বিষয়ে তাদের ন্যূনতম কোনো বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান নেই। তাই বর্জ্যজীবীরা বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহের সময় নানাভাবে শারীরিকভাবে আহত হয় এবং দুর্ঘটনার শিকার হয়। তারা ধারালো বস্তু, ভাঙা কাচ, মেডিকেল বর্জ্য দ্বারা নানাভাবে আহত ও আক্রান্ত হয়। তাদের কাজ সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ প্রায়শই যার পরিণতি শারীরিক প্রতিবন্ধিত্ব। এই জনগোষ্ঠী অত্যন্ত খারাপ পরিবেশে খালি হাতে ও খালি পায়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে। ফলে তারা নিয়মিতই বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কঠিন বর্জ্যসমূহ অপসারণ ব্যবস্থা আদৌ পরিবেশসম্মত নয়। প্রথমত, নগরের শিল্পজাত ও হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণের আলাদা ব্যবস্থা নেই। ২০০৯ সালের বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে শহরের দরিদ্র বর্জ্যজীবীদের মেডিকেল বর্জ্য দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতির শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কারণে তারা সর্বদাই নানা রকমের অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে– টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, আমাশয়, ডায়রিয়া এইচআইভি সংক্রমণ, নানা ধরনের চর্মরোগ, জন্ডিস, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়াসহ অনেক অসুখ। এর পাশাপাশি বিভিন্নভাবে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে যায়, থেঁতলে যায় আর কখনো কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় শরীরের কোনো অঙ্গহানি ঘটে। এসব ঘটেই মূলত বর্জ্যজীবীদের জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে। এর পাশাপাশি দারিদ্র্যের কবলে পড়ে বর্জ্যজীবীরা মারাত্মক অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার হয়ে প্রতিনিয়তই স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। উপরন্তু, তারা শারীরিক অসুস্থতায় তেমন কোনো ডাক্তার বা হাসপাতালের থেকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে না। রুগ্‌ণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির অভাবের ফলশ্রুতিতে তাদের অনেকেরই অকালমৃত্যু ঘটে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এর গাঠনিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো জানা থাকা জরুরি। কারণ বর্জ্য সংগ্রহের সময় এর গাঠনিক ও রাসায়নিক ধর্ম কিংবা গাঠনিক বৈশিষ্ট্য, আংশিক অনুপাত বিশ্লেষণ, বর্জ্য-কণার আকার বিশ্লেষণ, বর্জ্যের জলীয় অংশের পরিমাণ, বর্জ্যের ঘনত্ব, রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, প্রক্সিমিটি (বাঞ্ছনীয়তা) বিশ্লেষণ, আল্টিমেট (সর্বশেষ) বিশ্লেষণ, ছাই বিশ্লেষণ, তাপশক্তির পরিমাণ নির্ধারণ, আবর্জনার গাঠনিক/রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণসহ আবর্জনার উৎস নির্ণয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গাঠনিক বৈশিষ্ট্য– আবর্জনার গঠন সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হয়। ১. আংশিক অনুপাত বিশ্লেষণ, ২. বর্জ্য-কণার আকার বিশ্লেষণ (Particle size), ৩. বর্জ্যের জলীয় অংশ (Moisture content), ৪. বর্জ্যের ঘনত্ব (Density)|

আংশিক অনুপাত বিশ্লেষণ– এই বিশ্লেষণে যে সকল আলাদা রকমের উপাদান একত্রে মিশে আবর্জনা তৈরি হয়েছে সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং এগুলোর অনুপাত (শতকরা) নির্ণয়। এ ধরনের বিশ্লেষণ করার জন্য ডাস্টবিন/আবর্জনা ফেলার স্থান থেকে সদ্য ফেলা আবর্জনার নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোকে উপাদান অনুযায়ী ভাগ করা হয়, এবং প্রতিটা ভাগের ওজন ও আয়তন পরিমাপ করা হয়।

বর্জ্য-কণার আকার বিশ্লেষণ– যদি আবর্জনা থেকে যান্ত্রিক উপায়ে বা ছাঁকুনির/চালুনির সাহায্যে কিংবা বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে পুনঃব্যবহারযোগ্য আবর্জনা আলাদা করা হয় তাহলে বর্জ্য-কণার আকার সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে, প্রতি একক ওজনের আবর্জনাতে বড় আকারের তুলনায় ছোট আকারের কণার সংখ্যা বেশি থাকে।

বর্জ্যের জলীয় অংশ– জলীয় অংশ বের করার জন্য আংশিক বিশ্লেষণে আলাদা করা আবর্জনার ভাগগুলোকে ওভেনে শুকিয়ে আবার ওজন নেয়া হয়। তারপর, হারানো ওজনকে প্রথম ওজনের শতকরা অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ– % জলীয় অংশ = ১০০ (প্রাথমিক ওজন– শুকানোর পরের ওজন)/ প্রাথমিক ওজন। নির্দিষ্ট অংশের/উপাদানের জলীয় অংশ নির্ণয়ের কৌশল এটি। ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় আবর্জনার উপাদানগুলোর অনুপাত ভিন্ন হলেও আগের হিসাব করা প্রতি ধরনের/উপাদানের উপাত্ত থেকে পরীক্ষা ছাড়াই সামগ্রিক জলীয় অংশ বের করা যায়। এজন্য প্রতিটি উপাদানের জলীয় অংশ থেকে সেটি শুকালে কত ওজন হবে তা বের করা হয়। তারপর সম্পূর্ণ আবর্জনার শুকনো ওজনকে মোট ওজন দিয়ে ভাগ করা হয়। আবর্জনা নিষ্কাশনের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য জলীয় অংশের হিসাব থাকাটা জরুরি। যদি আবর্জনা পোড়ানো হয়, তাহলে সেই আবর্জনাতে আগুন ধরানোর আগে শুকাতে কতটুকু সময় লাগবে সেটি হিসাব করা যায় এবং সেই হিসাবে চুল্লিতে আবর্জনা দেয়ার সর্বোৎকৃষ্ট হার বের করা যায়। এছাড়া ঐ আবর্জনার তাপ-মূল্য কত তা আনুমানিক হিসাব করা যায়। আবর্জনার কিছু অংশ দিয়ে যদি কম্পোস্ট-সার বানানো হয় তাহলেও কম্পোস্ট তৈরির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট জলীয় অনুপাত রক্ষার জন্য কতটুকু শুকনো বস্তু মেশাতে হবে কিংবা কতটুকু পানি মেশাতে হবে তা হিসাব করে বের করা যায়। এছাড়াও বর্জ্যভূমিতে আবর্জনা ফেলা হলে সেখান থেকে কতটুকু নির্যাস বের হবে সেটিও অনুমান করা সহজ হয় এবং সেই অনুপাতে বর্জভূমির নিচ থেকে নির্যাস বের করার জন্য পাম্প চালানোর হার নির্ণয় করা যায়।

বর্জ্যের ঘনত্ব– বর্জ্যের ঘনত্ব নির্ণয়ের জন্য আংশিক বিশ্লেষণ করা উপাদানগুলোর ওজন নেয়ার পাশাপাশি এগুলোর আয়তনও মাপা হয়। তারপর ওজনকে আয়তন দিয়ে ভাগ করলেই ঘনত্ব পাওয়া যায়। প্রতিটি উপাদানের ঘনত্ব থেকে পূর্বের উদাহরণের মতো করেই যে কোন অনুপাতে মেশানো আবর্জনার ঘনত্ব বের করা সম্ভব। মূলত বর্জ্য পরিবহন এবং নিষ্কাশনের জন্য আবর্জনার ঘনত্ব জানা খুব দরকার। আবর্জনা

নেয়ার প্রতিটি গাড়ির নির্দিষ্ট ভারবহন ক্ষমতা থাকে। এছাড়া গাড়িগুলোর আকারের সীমাবদ্ধতাও থাকে। কোনো এলাকায় প্রতিদিন কী পরিমাণ (ওজন হিসেবে) আবর্জনা উৎপন্ন হয় সেটি জানা থাকলে এবং আবর্জনার আংশিক বিশ্লেষণ থেকে এর ঘনত্ব জানা থাকলে ঐ আবর্জনা সংগ্রহ করতে নির্দিষ্ট আকারের ও ক্ষমতার কতগুলো ট্রাক লাগবে তা আবর্জনা ব্যবস্থাপনাকারী সংস্থা নির্ধারণ করতে পারে। কোনো কোনো জায়গায় আবর্জনা সংগ্রাহক গাড়ির মধ্যে আবর্জনাকে চেপে আয়তন কমিয়ে ফেলার যন্ত্র থাকে। সেসকল ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট আকারের প্রতিটি গাড়িতে কতটুকু

আবর্জনা আনা হচ্ছে সেটি ঘনত্বের উপাত্ত থেকেই হিসাব করা হয়। কত টন আবর্জনা আনা বা নিষ্কাশিত হল সেই অনুযায়ী আবর্জনা ব্যবস্থাপনাকারী সংস্থাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ঐ আবর্জনা ফেলতে বর্জ্যভূমির আয়তন কত বড় হওয়া উচিত বা নির্দিষ্ট আকারের বর্জভূমিতে কতদিন যাবৎ আবর্জনা ফেলা যাবে সেটি নির্ধারণ করতেও ঘনত্বের উপাত্ত থাকা জরুরি।

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য– আবর্জনা থেকে বিকল্প উপায়ে শক্তি আহরণ করতে হলে এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জেনে রাখা জরুরি। এই উদ্দেশ্যে যেই রাসায়নিক বিশ্লেষণগুলো করা হয় তা সংক্ষেপে–

প্রক্সিমিটি (বাঞ্ছনীয়তা) বিশ্লেষণ–

১. জলীয় অংশ ১০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১ ঘণ্টা রাখলে কতটুকু জলীয় অংশ হারায়
২. উদ্বায়ী পদার্থ ৯০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জ্বালালে অতিরিক্ত যে অংশটুকু হারায়
৩. ছাই পোড়ানোর পর অবশিষ্ট অংশের পরিমাণ
৪. আটকে থাকা কার্বন ও বাকি অংশ

আল্টিমেট (সর্বশেষ) বিশ্লেষণ–

১. কার্বনের শতকরা পরিমাণ
২. হাইড্রোজেনের শতকরা পরিমাণ
৩. অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ
৪. নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ
৫. সালফারের শতকরা পরিমাণ
৬. ছাইয়ের পরিমাণ

ছাই বিশ্লেষণ–

১. ছাইয়ের গলন তাপমাত্রা নির্ধারণ
২. তাপশক্তির পরিমাণ নির্ধারণ

নির্দিষ্ট ওজনের প্রতিটি উপাদান পোড়ালে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ মাপা/নির্ধারণ করা হয়। ৩ অবস্থায় শক্তি মাপা হয়। সেগুলো হল–

১. যেভাবে আবর্জনা ফেলা হয় সেভাবে নিয়ে পোড়ালে কী হবে
২. শুকনা অবস্থায় পোড়ালে কী হবে
৩. শুকনা অবস্থায় ছাই বাদ দিয়ে পোড়ালে কী হবে

আবর্জনার গাঠনিক/রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণ– বিভিন্ন কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো এলাকা থেকে উৎপন্ন আবর্জনার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হতে পারে। পরিবর্তনের কারণগুলো সংক্ষেপে–

১. প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে। যেমন– খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি পরিবর্তন হলে কিংবা মোড়ক তৈরির প্রক্রিয়া/উপাদান বদল হলে।
২. বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে। তেলের দাম খুব বেড়ে গেল এর বদলে হয়তো কয়লা ব্যবহৃত হবে, তখন আবর্জনাতে কয়লার ছাইয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে। একইভাবে অর্থনৈতিক কারণে বিকল্প পদার্থ ব্যবহার আবর্জনার গড়নকে প্রভাবিত করবে।
৩. আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় পুনরায় ব্যবহার করা বা রিসাইকেল করার নিয়ম/সুবিধা শুরু হলে।
৪. নতুন আইন প্রয়োগের ফলে।
৫. ঋতুভেদে আবর্জনার ধরন আলাদা হবে।
৬. এলাকার মানুষের আচরণগত/স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হলে (প্রশিক্ষণ/সচেতনতা/শিক্ষার কারণে)।

এছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভৌগোলিক পার্থক্যের কারণেও আবর্জনার গড়ন আলাদা হয়।

আবর্জনার উৎস– আবর্জনার উৎস সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি আবর্জনা কল-কারখানা, পুরনো জলাশয় এবং শহরের নর্দমার ড্রেন ইত্যাদি জায়গা আবর্জনার উৎস হিসেবে আমরা ধরতে পারি, বর্তমানে আমরা নিজেদের অসচেতনতার ফলে নানা রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে নানারকম সামগ্রী সঠিক জায়গায় ফেলছি না। ফলে সেখান থেকেও অনেক আবর্জনা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যেমন– বেঁচে যাওয়া খাবার এবং প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি। এগুলো সঠিক জায়গায় না ফেলার কারণেই আবর্জনা সৃষ্টি দিনকে দিন বেড়ে চলেছে।

রান্নাঘরের পরিত্যক্ত আবর্জনা, হাটবাজারের পচনশীল শাকসবজি, মিল-কারখানার তৈলাক্ত পদার্থ, কসাইখানার রক্ত, ছাপাখানার রং, হাসপাতালের বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত না হওয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠছে ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমান সময়ে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং আধুনিক জীবনযাপনে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, প্যাকেটজাত খাবারসহ বিভিন্ন কৌটার ব্যবহার বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার পরিধিকে ক্রমেই নাজুক করে তুলছে। ফলে রোগবিস্তারকারী ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত ধাতব পদার্থগুলো জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত এরকম উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন বর্জ্য হচ্ছে– পৌর এলাকার বর্জ্য, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার বর্জ্য, পচনশীল ও অপচনশীল আর্বজনা, রান্নাঘরের বর্জ্য, পারমাণবিক আর্বজনা ইত্যাদি। এসব বর্জ্যের কারণে পরিবেশ দূষিত হওয়ার মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। শিল্পবর্জ্য, মেডিকেল বর্জ্য, প্রাণীজ বর্জ্যসহ বিভিন্ন রাসায়নিক বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে বায়ু, পানি ইত্যাদি। এর প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের ওপর,

পড়ছে জলবায়ুর ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রাণীর জটিল ও কঠিন রোগ দেখা দিচ্ছে। পরিবেশের ওপর জলবায়ুর প্রভাবের জন্য ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত, খাদ্যাভাবজনিত রোগসহ নানা জটিল ও অপরিচিত রোগ হচ্ছে, সেই সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের চারপাশের পরিবেশের এ বিপর্যয়ের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে বায়ুদূষণ। এটি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে ২২ শতাংশ মানুষ বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা ও ৩০ শতাংশ মানুষ জ্বালানি সংশ্লিষ্ট দূষণের শিকার। বিশ্বপরিবেশের যেমন দ্রুত অবনতি হচ্ছে, তেমনি বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরও দ্রুত। বায়ুদূষণের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। পৃথিবীর ৯১ শতাংশ মানুষ এমন জায়গায় বসবাস করছে, যেখানে বায়ু দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি। বিশ্বজুড়ে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন দূষিত বায়ু সেবন করে। আমাদের দেশে বায়ুদূষণের বড় কারণ সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব। বায়ুদূষণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের নানাবিধ রোগ, যেমন– হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে পানি পড়া থেকে শুরু করে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, হার্ট অ্যাটাক ও ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বায়ু দূষণ ছাড়াও বর্জ্য অব্যবস্থাপনা মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করছে। যা ভূমিক্ষয়সহ মাটির গুণগত পরিবর্তন ঘটায় ও এর বন্ধনকে দুর্বল করে। ভূমিক্ষয় ও ভূমি অপসারণ দুটি প্রক্রিয়াই মাটিকে ক্রমশ অনুর্বর করে তোলে। এতে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্যও বিনষ্ট হয়। এছাড়া দেশের বেশিরভাগ স্থানে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত সিউয়ার এবং ড্রেন নেই। ফলে সিউরেজের নিরাপদ অপসারণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ড্রেন উপচে পড়া এবং রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তরল বর্জ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিনষ্টের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের কঠিন বর্জ্যের চেয়ে তরল বর্জ্য অপসারণ বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও নাজুক। এখনও দেশের অনেক অঞ্চলে সেনিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই। এসব জায়গায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। গৃহস্থালি বর্জ্য নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তা ঘরবাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং রোগ-জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। এসব দূষিত তরল বর্জ্য কালক্রমে পুকুর, খাল অথবা নদীতে গিয়ে পড়ে এবং নদীদূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে দূষিত ভূপৃষ্ঠের পানির প্রভাবে সেখানকার ভূগর্ভস্থ পানিও ধীরে ধীরে দূষিত হতে থাকে। এসব পানি পান করে পানিবাহিত রোগের বিস্তার ঘটে। শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী বসবাসকারী এলাকার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। সেখানে অল্প জায়গায় বসবাসকারী মানুষের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। রেললাইনের ধারে, বাস বা লঞ্চ টার্মিনালে, এমনকি ফুটপাতে স্থায়ীভাবে বাস করা মানুষ যেখানে রান্নাবান্না করে খায়, তার আশপাশেই মলমূত্র ত্যাগ করে। ফলে তা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে।

গৃহস্থালি আবর্জনা, শিল্প ও কৃষিখামারের বর্জ্য এবং মানুষ ও পশুর মলমূত্র থেকে প্রতিনিয়ত ঘটছে বায়ু-পানি দূষণ। শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত এসিড, বালাইনাশক, তেল ও বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করে। ফসফেট, রাসায়নিক সার, সাবানজাতীয় দ্রব্য ও বিষ্ঠা, জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদকে মাত্রাতিরিক্ত পুষ্টি যোগানোর মাধ্যমে পানি দূষিত করে। অধিক পুষ্টির ফলে জলজ শ্যাওলার অত্যধিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময়ে মৃত্যু ঘটে, ব্যাকটেরিয়া এসব মৃত শ্যাওলার পচন ঘটাতে অত্যধিক পরিমাণে পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। এতে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। শিল্প ও পৌরবর্জ্য বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলোকেও দূষিত করছে। ইদানীংকালে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে পশুবিজ্ঞানীদের চিন্তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পশুসম্পদ বর্জ্য। একটি গরু দৈনিক প্রায় ১২-

১৫ কেজি, ছাগল ও ভেড়া ১.৫-২ কেজি, লেয়ার ১০০-১৫০ গ্রাম, ব্রয়লার ১০০-২০০ গ্রাম বর্জ্য উৎপন্ন করে থাকে। পশুসম্পদ বর্জ্যের উৎসগুলো হচ্ছে গবাদিপশু উৎপাদিত গোবর, খামারের বর্জ্য খাদ্য, বর্জ্য পানি, গোবরের অপরিকল্পিত সংরক্ষণ ও মৃত পশুর সমাধি থেকে উৎপন্ন দুর্গন্ধ ইত্যাদি। গবাদিপশুর উৎপাদিত গোবর যদি খামারে ফেলে রাখা হয় তবে এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে এই পশুসম্পদ বর্জ্য। ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো হচ্ছে– মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন ইত্যাদি। পশুসম্পদ বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে যেসব সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলো হল– ভূ-গর্ভস্থ জল দূষণ, বায়ুদূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। পশুসম্পদ বর্জ্য থেকে উৎপন্ন দুর্গন্ধ মানুষ ও পশুপাখির বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন– অস্থি সমস্যা, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি। ক্ষতিকর গ্যাসগুলোর মাত্রাতিরিক্ত সেবন মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এছাড়া এতে সৃষ্টি হয় এসিডবৃষ্টি। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও নাইট্রেট পরিবেশে পানিদূষণের অন্যতম কারণ। খাবার পানিতে উচ্চতর ঘনত্বের নাইট্রেটের উপস্থিতি মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। অতিরিক্ত নাইট্রেটযুক্ত খাদ্য ও পানি গ্রহণের ফলে শরীরে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। নাইট্রেটযুক্ত পানি খামার থেকে পুকুরে প্রবেশ করলে তা মাছ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবেশে অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে পশুসম্পদ থেকে উৎপাদিত গোবর। প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ গোবর কৃষিজমিতে প্রয়োগ করার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ভূ-গর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করছে, যা পানি দূষণ ও জনগণের স্বাস্থ্যের হুমকি তৈরি করছে। পশুসম্পদ বর্জ্য থেকে উৎপাদিত মিথেন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ শতাংশ দায়ী। একটি গবাদিপশু বছরে প্রায় ৭০-১২০ কেজি মিথেন নির্গমন করে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে ২৩ গুণ বেশি দায়ী।

আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুসম্পদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পশুবিজ্ঞানীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের উৎপাদিত পদ্ধতিতে পশুসম্পদ বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। এ খাতে পশুবিজ্ঞানীদের দেওয়া গবেষণা অনুদান পশুসম্পদ বর্জ্যের আধুনিক ও নিরাপদ অপসারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে ও দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামকে পরিছন্ন, বাসযোগ্য, পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে। পশুবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশে, বিশেষত শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি ঢাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সোশ্যাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ ওয়েস্ট কনসার্ন, বাসাবাড়ি পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার কাজ করছে। ইউনিসেফ সিটি কর্পোরেশন ও শহরাঞ্চলে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেছে। এতদসত্ত্বেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মনোন্নয়নে, বিশেষত শিল্পকারখানার বর্জ্য ও হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসব উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল। এ কারণে আবর্জনা এখন বোঝা হয়ে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে বিপন্ন করে চলেছে। বর্জ্য মোকাবিলা এখন পরিবেশ রক্ষায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নবায়নযোগ্য জৈববর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে আগ্রহ তৈরি করা উচিত। বিখ্যাত দার্শনিক নেপোলিয়ন বলেছেন– 'যে যে-বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সে সে-বিষয়ে শিক্ষিত, কাজেই সবাই শিক্ষিত।' আর নিরক্ষর, দরিদ্র এসব বর্জ্যজীবীদের প্রশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব আমাদে, রাষ্ট্রের, সবার। সবুজ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এসব বিষয় জানতে হবে এবং তদানুযায়ী কাজ করলে বর্জ্য

সংগ্রহ আর তা প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ হবে। তাই পরিবেশ সুরক্ষা এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষিত করে তোলার বিকল্প নেই।

বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ যা ভৌত পরিবেশের ক্ষতিসাধন এবং জীব ও জড়ের আন্তঃক্রিয়ার ভারসাম্য বিনষ্ট করে। মানুষের কর্মকা-ের ফলে প্রায়শই অনেক বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এসব বর্জ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিল্প-কারখানার স্তর, জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর উৎসও বিভিন্ন বাসগৃহ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, পরিবহন, কৃষি প্রভৃতি। গৃহস্থালিজাত বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মধ্যে থাকে প্রধানত ভাঙা-কাচ, ধারালো ধাতব বস্তু, রং, পেট্রোলিয়াম জাতীয় জৈবপদার্থ ইত্যাদি। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যথা– হোটেল, রেস্তোরাঁ, গ্যাসোলিন-স্টেশন, শিল্পকারখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি থেকেও সাধারণত একই ধরনের বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এসব বর্জ্যের একটি বড় অংশ শিল্পকারখানা এবং অপেক্ষাকৃত পরিমাণে কৃষিখাত থেকে আসে। কৃষিতে ব্যবহৃত প্রচুর পরিমাণ বালাইনাশক মাটি ও পানিতে অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হয় যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। বাংলাদেশে গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক উৎস থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, তবে পরিমাণে খুব বেশি নয়। কারণ দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণ জৈব দ্রাবক ও গৃহস্থালির কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহারে সমর্থ নয়, আর কাচের বোতল ও ধাতব বস্তুর মতো বর্জ্যগুলো সাধারণত পুনর্ব্যবহৃত হয়। তবে মোটরযান মেরামত কারখানাগুলো থেকে প্রচুর ইঞ্জিনের লুব্রিকেটিং তেল (স্থানীয়ভাবে মবিল) ফেলে দেয়া হয়। এ বর্জ্য তেলের কিছুটা আবার শোধন করে জিনিসপত্র পরিষ্কার করার কাজে লাগানো যায়। এভাবে এসব পদার্থ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আবারও বিভিন্ন বিষাক্ত বর্জ্য উৎপন্ন হতে পারে। অবশ্য মোটরযানের পরিত্যক্ত বর্জ্য অনেক দেশে এখনও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হয়ে ওঠেনি।

শিল্পকারখানার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পবর্জ্য নানা ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণভাবে খাদ্যশিল্প থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত বর্জ্যের পরিমাণ কম। ওষুধশিল্প থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত বর্জ্যের পরিমাণও বেশি নয়, কারণ এসব শিল্প প্রধানত বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ওষুধের প্যাকেজিং করে থাকে। ফলে এতে খুব বেশি পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টির সুযোগ নেই। আমাদের দেশে শিল্প উৎপাদন কয়েকটি খাতে সীমাবদ্ধ। যেমন বস্ত্র, চামড়া, সার, সিমেন্ট ইত্যাদি। আর এসব শিল্পকারখানার অধিকাংশই তাদের বর্জ্য নদ-নদীতে ফেলে। শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর চাপে তারা এসব বর্জ্য কিছুটা শোধন করলেও সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলে না। ঢাকা শহরের হাজারীবাগ এলাকার প্রায় ২৫০টি চামড়া শিল্পকারখানায় কোটি কোটি টুকরা পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এগুলোতে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক বহুলাংশে অপরিশোধিত অবস্থায় নদীতে পড়ছে। একটি প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কেবল তেজস্ক্রিয়তা প্রশমনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই লাঘব হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তা প্রশমনের এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রযুক্তি মানুষ এখনও উদ্ভাবন করতে পারেনি। তাই তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্কাশনের সাধারণ পদ্ধতি হল তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরাপদ পর্যায়ে নেমে না-আসা পর্যন্ত এসব বর্জ্য নিরাপদ স্থানে মজুত রাখা। বাংলাদেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান, নিরাপদ ব্যবহার এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের অপসারণ, পূর্ব মজুত ইত্যাদি কর্মকা- তদারক করা বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের দায়িত্ব। বর্তমানে বাংলাদেশে, বিশেষত শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে, বিশেষত শিল্পকারখানার বর্জ্য ও হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসব উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল। বাংলাদেশের মতো একটি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নগরায়নের দেশে, শহরের বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। শহরের মান বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ জরুরি। সেইসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান আইনি কাঠামোর বাইরেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আরও আইন, বিধিমালা, কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি।

বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সময়ের দাবি। মানবসৃষ্ট বর্জ্য জলবায়ুর ওপর যে আঘাত এনেছে তা নিয়ে সারা পৃথিবী উদ্বিগ্ন। জলবায়ুর ওপর বর্জ্যের প্রভাব কমাতে জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তাদের কর্মসূচিগুলো হল– সব দেশে জলবায়ু সম্পর্কিত বিপদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজন ক্ষমতা জোরদার, জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাকে জাতীয় নীতি, কৌশল এবং পরিকল্পনায় একীভূতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব হ্রাস এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নতকরণ ও প্রারম্ভিক সতর্কতা ইত্যাদি। আর সবার জন্য সুস্থ-সুন্দর আবাসন নিশ্চিতকরণসহ বাসযোগ্য ও নিরাপদ আবাসস্থলের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ১৯৮৬ সাল থেকে সারা বিশ্বে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। পরিতাপের বিষয়– আমাদের জন্য এই বসতি অথচ আমরা মানুষেরা সেই আবাসস্থলে অবস্থান করেই বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি অকপটে, আর বলছি সুন্দর-সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্য আমাদের যত কর্মযজ্ঞ! আমরা যত কথাই বলি না কেন– বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক চর্চাটা আসলে ঘরেই শুরু করতে হয়। সারা বিশ্বে বছরে সাত শত থেকে এক হাজার কোটি টন বর্জ্য তৈরি হয়, যা সম্পদে রূপান্তর করাই উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে জাতিসংঘ। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে উন্নত দেশগুলো বর্তমানে 'ফাইভ-আর' প্রযুক্তি অনুসরণ করছে। আমাদেরও সেদিকে এগিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্জ্য নিয়ে দুটো বিশেষ কথা প্রচলিত। প্রথমটি হল– আজকের বর্জ্য আগামীকালের সম্পদ। আর দ্বিতীয়টি হল– আবর্জনাই নগদ অর্থ। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় উন্নত দেশগুলোতে। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেন ও নরওয়েতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, এবং এ ব্যবসায়টি সেখানে অত্যন্ত লাভজনক। একে ঘিরে তারা অন্য দেশ থেকেও বর্জ্য আমদানি করছে।

আবর্জনা দিয়ে ব্যবসা করছেন অনেকেই উদাহরণস্বরূপ– বিলিকিস আদেবিয়ি-আবিওলা যুক্তরাষ্ট্রে এমবিএ করার পর আইবিএম-এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পাঁচ বছর কাজ করার পর নিজ দেশ নাইজেরিয়ায় গিয়ে বর্জ্য নিয়ে ব্যবসা করছেন। দেশটির সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা-অধ্যুষিত শহর লাগোসের আবর্জনা নিয়ে ব্যবসা করছেন তিনি। কোম্পানির নাম 'উইসাইকেলার্স'। তাদেরকে আবর্জনা দেয়ার মাধ্যমে স্থানীয়রা 'উপহার' পেয়ে থাকেন। আর আবিওলা'র কোম্পানি ঐ আবর্জনা থেকে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে। গ্যাবনের একটি কোম্পানি আবর্জনা থেকে ইট তৈরির পরিকল্পনা করছে। এতে যেমন পরিবেশের লাভ হবে তেমনি কিছু লোকেরও কর্মসংস্থান হবে। লাম্বারেনের তারকা বনে গিয়েছেন– ৩৭ বছর বয়সী মাকায়া। তিনি একটি বর্জ্য সংগ্রহকারী কোম্পানি চালু করেছেন যেখানে আটজন কাজ করে। তিন চাকার যানে করে প্রতিদিন লাম্বারেনের পাশে থাকা স্তূপে আবর্জনা ফেলা হয়। শুরুর বিনিয়োগের টাকা দিয়ে এর অর্থায়ন করে কোম্পানি। একটি প্রতিযোগিতায় জিতে এই অর্থ পেয়েছিলেন মাকায়া। লাম্বারেনের জঙ্গলে একটি রিসাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপন করতে চান মাকায়া। বালুর সঙ্গে প্লাস্টিক বর্জ্য মিশিয়ে

সিমেন্টের মতো ইট তৈরি করা হবে। রাস্তা তৈরিতে এই ইট কাজে লাগানো যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। অ্যান্ড্রু মুপুয়া'র বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর তখন তাঁর বাবা-মা দু'জনেরই চাকরি চলে যায়। আর স্কুলে পড়ার সময়ই তাঁকে কাগজের ব্যাগ তৈরির ব্যবসা শুরু করতে হয়। পুঁজি জোগাড় করতে ৭০ কেজি প্লাস্টিক বোতল বিক্রি করেন ও শিক্ষকের কাছ থেকে টাকা ধার নেন। ব্যাগ তৈরি শিখতে ইন্টারনেট আর ভিডিওর সাহায্য নেন তিনি। বর্তমানে অ্যান্ড্রুর অধীনে ২০ জন লোক কাজ করছে। আফ্রিকার ফুটওয়্যার ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ইথিওপিয়ার 'সোলরেবেলস' বিশ্বে অনেক জনপ্রিয়। বেথেলহেম টিলাহুন আলেমু'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিটি গাড়ির পুরনো টায়ার, ফেলে দেয়া জামাকাপড় ব্যবহার করে জুতা তৈরি করে। বাংলাদেশেও অনেকে আবর্জনা নিয়ে কাজ করছে। এ এম রঞ্জু ও পীযুষ দত্ত নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের দুই শিক্ষার্থী গৃহস্থালির বর্জ্য দিয়ে জ্বালানি তেল, পেট্রোলিয়াম গ্যাস, ড্রাই আইস, বায়ো ইথানল, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও জৈব সার তৈরি করেছেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছিলেন তাঁরা। তাঁদের গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তছলিম উর রশিদ, প্রভাষক সাজেদুল ইসলাম, বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রোবটিকসের কর্মকর্তা জিমি মজুমদার ও এবিসি কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল কোম্পানির চেয়ারম্যান অতনু সমদ্দার। মানববর্জ্য কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায় তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত– ব্র্যাকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম। মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল কার্যকর বাজারভিত্তিক সমাধান এবং এর চাহিদাকে প্রমাণ করা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, স্থানীয় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী কর্মকা-ের সূচনা– এই তিনটি পর্যায়কে গুরুত্ব দিয়ে জামালপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসনে বিদ্যমান আবর্জনা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বর্তমানে। সরকারের অনুমতিক্রমে ব্র্যাক জামালপুরের বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টের সংস্কার করে এবং মানববর্জ্যের কম্পোস্ট মিশ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে।

উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বর্জ্যের পুনঃব্যবহার। যেমন– পশুসম্পদ বর্জ্য থেকেই আবার পশুপাখির খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পর পশুসম্পদ বর্জ্য থেকে উৎপাদিত পশুখাদ্যে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। যেমন– গবাদিপশুর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পোল্ট্রি খাবার হিসেবে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। পোল্ট্রি বর্জ্য থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত আমিষ গ্রহণ গাভীর দুধ উৎপাদনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না এবং তা একইসঙ্গে নতুন খাদ্যে আমিষের চাহিদা কমায়, ফলে খরচ হ্রাস পায়। পশুসম্পদ বর্জ্যে সঠিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কম্পোস্টিং। উৎপাদিত কম্পোস্ট কৃষিজমিতে প্রয়োগে একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে রাসায়নিক সারের খরচ কমে। উর্বরতা বৃদ্ধিতেও এটি ভূমিকা রাখে। এর বাইরে বায়োগ্যাস উৎপাদন পশুসম্পদ বর্জ্য সদ্ব্যবহারের অন্যতম উপায়। গ্রামীণ পরিবেশে জ্বালানি ও শক্তির সহজতম উৎস হচ্ছে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। এর মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস পায় এবং উৎপাদিত জৈব সার জমির উর্বরতা বাড়ায়। সর্বোপরি পশুসম্পদ বর্জ্যের সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশে পশুসম্পদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট পশুসম্পদ বর্জ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই মানুষ জ্বালানির কাজে ব্যবহার করছে। ফলে একদিকে যেমন এটি পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে কৃষকেরা সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার

মাধ্যমে অর্জিত অর্থনৈতিক লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার ব্যতিক্রমী এক প্রকল্প নিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর। এরই মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রংপুর ও কক্সবাজারে বর্জ্য থেকে দৈনিক ৫০ টন সার উৎপাদিত হচ্ছে। আর এই সার বাসাবাড়ির ছাদের সবজিবাগান ও জমির ফসলে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ৬,০০০ টন গৃহস্থালি ও প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য ভ্যানে আবর্জনা টানা শ্রমিক ও সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ও স্কাভ্যাঞ্জারসগণ শহরের বাসাবাড়ি, রাস্তাঘাট, ডাস্টবিন, ট্রান্সফার সেন্টার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে তা মাতুয়াইল ও বইলারপুর বর্জ্যের ডাম্পে ফেলছে আর ফেলে দেওয়া বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের জন্য ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মাতুয়াইলে সার কারখানা স্থাপনের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। আর উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমিনবাজার এলাকায় সার কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা ভাবছে। বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের প্রকল্প পরিচালক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের (আইন) দেয়া তথ্যমতে– দেশের চারটি কারখানায় বর্জ্য থেকে সার উৎপাদিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন পেলে দেশের ৬৪টি জেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এ ছাড়া ফেনীতে সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। আর কিশোরগঞ্জের কারখানা নির্মাণের কাজও শিগগিরই শুরু হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে 'ন্যাশনাল থ্রি আর (রিডিউস, রিইউজ অ্যান্ড রিসাইকেল) স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' প্রণয়ন করে। এ প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। ব্র্যাক জামালপুর শহরে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে প্রায় বছর দুই আগে, এতে স্থানীয় জনগণের বেশ সাড়াও মেলে। ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম হয়ে ওঠে ইতিবাচক পরিবর্তনের হাতিয়ার। ভ্যাকুটাগ মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে মানববর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক করা হয়েছে। একটি অটোরিকশায় ৭০০ লিটারের বর্জ্য সংগ্রাহক ট্যাংক ও ভ্যাকুটাগ মেশিন থাকে। এই গাড়ি সহজেই সংকীর্ণ এবং কাঁচা রাস্তায় চলাচল করতে পারে। ফলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পিট/সেপ্টিক ট্যাংকের বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সহজ ও উন্নত হয়েছে। ব্র্যাক পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যাতে তারা পিট-অ্যাম্পটিয়ারের পেশায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। তারা শুধু আধুনিক সরঞ্জাম যেমন– ভ্যাকুটাগ মেশিন চালানোই শিখবে না, সেইসঙ্গে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জ্ঞানও লাভ করবে। বর্তমানে এই প্রকল্পে পিট অ্যাম্পটিয়ার পণকুমার ভাস্কর, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কঠিন বর্জ্য সংগ্রাহকারী উদ্যোক্তা নূর হোসেন, আশেক মাহমুদ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মো. রোকন আলী খান সহ অনেকেই কাজ করছেন। আর স্থানীয় কৃষেকরা মানববর্জ্য থেকে উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহারে সুফল পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠায় ক্ষুদ্র আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পও চালু আছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

এদিকে প্লাস্টিক বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই ব্যবসা করছেন। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ভালো হচ্ছে, তেমনি কিছু মানুষের কর্মসংস্থানও হচ্ছে। প্লাস্টিক বোতল রিসাইকেল করে এমন অনেক কারখানা গড়ে উঠেছে ঢাকায়। তাদের হয়ে পরিত্যক্ত বোতল সংগ্রহ করছেন অনেকে। এতে তাদের দারিদ্র্য দূর হচ্ছে। বোতলগুলো মেশিন দিয়ে টুকরো করে প্লাস্টিক পণ্য বানায় এমন কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হয়। কিছু অংশ বিদেশে, বিশেষ করে চীনেও রপ্তানি হয়ে থাকে। থাটো গাটহানিয়া ও রেয়া এনগোয়ানে নামের দক্ষিণ আফ্রিকার দুই তরুণী প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে স্কুলব্যাগ তৈরি করেন। দরিদ্র

শিক্ষার্থীদের এগুলো দেয়া হয়। এসব ব্যাগে সোলার প্যানেল বসানো আছে। আর শিক্ষার্থীরা হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসার ফলে প্যানেলগুলো যে চার্জ পায় তা দিয়ে রাতের বেলায় আলো জ্বলে। তাই মোমবাতি না জ্বালিয়ে তারা আলো পেতে এটি ব্যবহার করতে পারে। লরনা রুট্ট ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে কেনিয়ার নাইরোবিতে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন। এসব প্লাস্টিক দিয়ে তাঁর কোম্পানি বেড়া তৈরি করে। ঘরবাড়ি সহ সংরক্ষিত এলাকায় বেষ্টনী দিতে তাঁর বেড়া ব্যবহৃত হয়। কাঠের বদলে এ সব বেড়া খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়– বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বর্জ্যজীবী, আবর্জনার ভ্যান কর্মী, সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, রিসাইক্লিং কর্মীদের রয়েছে বিশাল অবদান। কারণ– ২০০৫ সালে বাংলাদেশ প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ২৬৩,০০০ টন পুনঃচক্রায়িত রেজিন বা প্লাস্টিক তৈরির কাঁচামাল ব্যবহার করে; যার ফলে ৪০৫ মিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় বাঁচানো সম্ভব হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) এলাকায় ২২,৭৯২ জন প্লাস্টিক বর্জ্য পনঃচক্রায়নের কাজে নিয়োজিত আছে; যা ডিসিসি এলাকায় নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ১ শতাংশ। ২০০৮ সালে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্লাস্টিক সামগ্রীর বাজার ছিল ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। বর্তমানে আরও অনেক বেশি আর সেই ধারাবাহিকতায় আশা করা যায় ২০২০ সালে এর বাণিজ্যমূল্য ৪ বিলিয়ন ডলার হবে। তৈরিপোশাক শিল্প-কারখানার বর্জ্যের বাজার মূল্য ২০০০ কোটি টাকারও বেশি। পত্রিকার এক রিপোর্টে দেখা যায় বর্তমানে প্রায় ১৫০,০০০ মানুষ তৈরিপোশাক শিল্প বর্জ্য রিসাইক্লিং বা পুনঃচক্রায়ন কাজের সঙ্গে জড়িত। এক হিসাবে দেখা যায় প্রতি বছর সংগৃহীত লেড-এসিড ব্যাটারির পুনঃচক্রায়নের ফলে প্রায় ৩৪২০ টন লেড পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় যার আমদানিমূল্য ৩৬০ মিলিয়ন টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পশু বর্জ্য (নাড়ি-ভূড়ি, অ-কোষ ইত্যাদি) রপ্তানি করে ১৪.৭১ মিলিয়ন ডলার আয় করে বাংলাদেশ। ঐ একই বছরে গবাদিপশুর হাড় ও শিং রপ্তানি করে ৩.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। বর্জ্যজীবীরাই এসব পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যসামগ্রী রাস্তা, উন্মুক্ত স্থান, ডাস্টবিন এবং ডাম্প সাইট থেকে সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাছাই ও প্রক্রিয়াজাত করে পুনঃচক্রায়ন বা রিসাইক্লিং-এর জন্য কারখানায় প্রেরণ করে থাকে।

ডিজিটাল যুগের বিষাক্ত বর্জ্যের আরেক নাম ই-বর্জ্য। ই-বর্জ্য উৎপাদনে চীন পৃথিবীর শীর্ষে। গত এক বছরে দেশটিতে উৎপাদিত ই-বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৭ দশমিক ২ মিলিয়ন টন। ই-বর্জ্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে– জাপান ও ভারত। আমাদের দেশেও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্রুত হারে বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন ইলেকট্রনিক পণ্য কেবল আমদানিই করছে না বরং উৎপাদনও করছে। একটি মোবাইল ফোন গড়ে তিন বছরের বেশি ব্যবহার করা যায় না। ফলে তিন বছর পর এটি ইলেকট্রনিক বর্জ্যে পরিণত হয়। সেই হিসেবে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন কোটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, ১ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যাটারি, ১ কোটি ২০ লক্ষ চার্জার, ১০ লক্ষ কম্পিউটার এবং প্রায় ৪০ লক্ষ টিভি, ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর, ওভেন, এসি পরিত্যক্ত হচ্ছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে এসব ভয়াবহ ক্ষতিকর ই-বর্জ্যে পরিণত হচ্ছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে চার লাখ টন ইলেকট্রনিক বর্জ্য হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এটি প্রায় ১২ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমরা যখন থ্রিজি থেকে ফোরজিতে সিম বদল করেছি তখন এই সিমও ই-বর্জ্যে পরিণত হয়েছে। ফোরজি থেকে ফাইভজিতে যখন যেতে হবে, তখন হ্যান্ডসেটই বদলাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এতে ই-বর্জ্য বাড়বে। এসব ই-বর্জ্য পচনশীল না হওয়ায় এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। আর তা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ

করে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এসব বর্জ্যের ভেতরে– সিসা, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিকসহ বিভিন্ন ধরনের হেভি মেটাল থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ই-বর্জ্য শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই অটিস্টিক শিশুর জন্মহার বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ অনিরাপদ ই-বর্জ্য। তবে, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এসকল বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসার সম্ভাবনাও প্রচুর। পরিবেশগত ও সম্পদের ব্যবহার বিবেচনায় এই রিসাইক্লিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ই-বর্জ্য পরিশোধন করে কপার বা স্বর্ণের মতো মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও বিকাশমান শিল্পনির্ভর অনেক দেশেই লাভজনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই কয়েকটি রিসাইক্লিং ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে, কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ই-বর্জ্য সংগ্রহ করা না হলে তা কেবল নামমাত্র-ই থেকে যাবে।

উন্নত দেশগুলোতে মোবাইল বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানই বাতিল মোবাইল পুনরায় কিনতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশেও এরকম ব্যবস্থা চালু করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। সারাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে, বাড়ছে কম্পিউটার ল্যাপটপসহ বিভিন্ন আধুনিক ডিভাইসের ব্যবহার। এসব জিনিসপত্র নষ্ট হওয়ার পর কোথায় যাবে বা এসব রিসাইকেল করে নতুন কোনো বাজার তৈরির ব্যাপারেও এর আগে তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে ই-বর্জ্যের পরিমাণ দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, এতে করে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ, নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। ই-বর্জ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা করা গেলে আর্থিক ও সামাজিক দু'ভাবেই লাভবান হওয়া সম্ভব। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোরিয়া ও ভারত অনেক এগিয়েছে। আমরা তাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কী পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং এসব বর্জ্য কোথায় যাচ্ছে, তা পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘের একাধিক সংস্থা। আমরা সানন্দে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারি। দেশের ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা গেলে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে এ কাজ। ই-বর্জ্য এখন দৃশ্যমান, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে একটি সম্ভাবনাও বটে। ই-বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে, ই-বর্জ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে নষ্ট মোবাইল ফোন ফেরত দিলে যাতে ফোনের মালিক কিছু টাকা পায়, সে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ঢাকার ৫ থেকে ১০টি শপিংমলে এ উদ্যোগ কার্যকর করা হবে। এরপর পুরো বাংলাদেশে সেটি চালু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব মোবাইল দিয়ে নষ্ট মোবাইল ফোনসেট সংগ্রহ করে সেগুলো বিভিন্ন রি-সাইক্লিং শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা যাবে। এসব ফোনসেটের বিভিন্ন উপাদান থেকে নানারকমের জিনিস উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামের প্রতিটি অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের কোনো বিকল্প নেই। শহর-বন্দরে সর্বত্র পর্যাপ্ত সংখ্যক সঠিক মাপের উন্মুক্ত ড্রেন ও ভূ-গর্ভস্থ সিউয়ার নির্মাণ করতে হবে। ঘরবাড়িতে সেপটিক ট্যাংক ও হাউস ড্রেন নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা জরুরি। এসব ড্রেনকে সঠিকভাবে মেইন সিউয়ারের সঙ্গে সংযোগ দিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনবল কাঠামো বিস্তৃত করতে হবে। বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি সহজে নিষ্কাশিত হওয়ার জন্য রাখতে হবে স্টর্ম-সিউয়ার। কেন্দ্রীয়ভাবে পয়ঃশোধনাগার নির্মাণ করে পরিশোধিত তরল বর্জ্য চূড়ান্ত অপসারণ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। দখল হয়ে যাওয়া নদী, খাল উদ্ধার করে তা পুনঃখননের ব্যবস্থা নিতে হবে। নদ-নদীকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার আসল রূপ। কঠিন বর্জ্যকে রিসাইক্লিং করার জন্য আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প হাতে

নিতে হবে। এসবের নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় রাখতে দেশের আপামর জনগণকে সচেতন করে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করা যেতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশনে জনগণের করণীয় সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ এবং নিয়মিত মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করলে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে পয়ঃনিষ্কাশন সংশ্লিষ্ট নতুন আইন প্রণয়ন করে তার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার কথা ভাবা দরকার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। কেননা আমাদের দেশে প্রচলিত আইন না মেনে চলার একটি প্রবণতা বরাবরই লক্ষ করা যায়। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি শহর-গ্রামকে পরিচ্ছন্ন, বসবাসযোগ্য, পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যাশায় দেশবাসী। এছাড়া বায়োগ্যাস প্রস্তুত, জৈব সার তৈরির মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং জৈব সারের ব্যবহার বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লব করার আন্দোলন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে এবং প্রজন্মের জন্য আবাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সেইসঙ্গে বর্তমান সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সফলতা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে গণসচেতনতা ও গণজাগরণ গড়ে তুলতে হবে, তাহলে খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ থেকে আমরা রক্ষা পাব।

প্রাথমিক স্তর থেকেই জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করতে ব্যর্থ হলে গৃহস্থালি ও ব্যবসায়ীদের জরিমানা করার বিধান রেখে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'র খসড়া তৈরি করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। তবে তা কেবল খসড়ায় না থেকে কার্যকর করতে হবে। জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করা বিষয়ে খসড়া নীতিমালায় একটি বিধান রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে– যদি গৃহস্থালি থেকে জৈববর্জ্য যেমন, রান্নাঘরের আবর্জনা এবং অজৈব বর্জ্য যেমন কাগজ, প্লাস্টিক, কাচ, কাপড়, রবার এবং কাঠের আসবাবপত্র তাদের ঘর থেকেই আলাদা না করে, তাহলে গৃহস্থালির মালিককে জরিমানা করা হবে। তাঁদেরকে জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করে দু'টি পাত্রে ঘরের সামনেই রাখতে হবে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে, নির্মাণকাজের আবর্জনা নির্মাণকাজের এলাকার মধ্যেই সংরক্ষণ করতে হবে। যতক্ষণ-না সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য সংগ্রাহকেরা এটি সংগ্রহ করে। যদি নির্মাণকাজের আবর্জনা নির্মাণসাইটের বাইরে সরানো হয়, তাহলে কন্ট্রাক্টর বা নির্মাণ এলাকার মালিককে জরিমানা করা হবে। ফুটপাতের বিক্রেতা, দোকান এবং রেস্টুরেন্টকেও প্রাথমিক স্তর থেকেই জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করতে হবে এবং আলাদা দু'টি পাত্রে রাখতে হবে। যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে প্রথমবার সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা এবং একই কাজ পুনরায় করার জন্য সর্বোচ্চ ৪,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। ইতোমধ্যে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার স্লোগান নিয়ে বর্তমান সরকার দেশে কার্যকর 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' তৈরি করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে, বর্জ্যকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা বর্জ্য রিসাইক্লিং করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। দেশে কার্যকর রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে, 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে'র অধীনে '৬৪ জেলায় কমপোস্টিং' প্রকল্পের মতো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

আমরা একটু সচেতন হলেই বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে পারি। জার্মান সরকার এক্ষেত্রে বেশ সফলতা পেয়েছে। দেশটিতে ৮৭ শতাংশ আবর্জনাই রিসাইকেল করা হয় যেমন– সেখানে রান্নার সময় তৈরি হওয়া যত আবর্জনা এক ব্যাগে রেখে কাগজপত্র অন্য ব্যাগে রাখা হয়। কিংবা রং অনুযায়ী, আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কন্টেইনারে সেগুলো ফেলা হয়। যেমন– কালো রঙের কন্টেইনারে ফেলা হয় রান্নার সময় উৎপাদিত জৈব আবর্জনা, কাগজপত্রের জন্য নীল কন্টেইনার আর প্লাস্টিক দ্রব্যের জন্য হলুদ কন্টেইনার। এই তিন ধরনের কন্টেইনার প্রায় সব বাড়ির সামনেই দেখা যায়। পাশাপাশি রয়েছে কাচের বোতল ফেলার নির্দিষ্ট কিছু কন্টেইনার। বাদামি, সবুজ আর সাদা বা স্বচ্ছ বোতলগুলো রং দেখে ফেলতে হয় সেসব কন্টেইনারে। তবে ব্যাটারি, অ্যাসিড বা রঙের মতো দ্রব্য ফেলা যায় না এ সব কন্টেইনারে। সেগুলোর জন্য রয়েছে আলাদা পাত্র। বাসার আসবাবপত্র পুরনো হয়ে গেলে, যেগুলো ফেলে দিতে হবে বা পুরনো টিভি ফ্রিজ সেগুলো কিংবা এধরনের বড় জিনিসপত্র ফেলার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু দিন। এসব দিনে বাড়ির সামনে সেগুলো ফেলে দিলে নগর কর্তৃপক্ষ কিংবা যাদের সেসব প্রয়োজন তা নিয়ে যায়। পুরনো জামাকাপড় ফেলার জন্য রয়েছে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বা পার্কিংলটে এক ধরনের কন্টেইনার যেগুলোতে পুরনো জামাকাপড়, জুতো ফেলা যায়। সেগুলো আবার দান হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যবহার-উপযোগী পোশাক গরিব-দুঃখীদের দান করা হয়। আর প্লাস্টিকের বোতল ফেরত দিলে কিছু পয়সা পাওয়া যায়। তাই সেই বোতল সবাই নির্দিষ্ট মেশিনে বা দোকানে জমা দেয় পয়সা ফেরত পেতে। ২০১৯ সালের বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন– 'বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ সম্ভব।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন– 'বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিসমূহ টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। উপরন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত হবে।'

আর পরিকল্পিতভাবে আবর্জনা ফেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা নিখুঁত করা এবং অবশ্যই যতটা সম্ভব রিসাইকেল করা। তবে বর্তমানে বেশ কঠোরভাবে প্রত্যেকটি মহল্লায় ভ্যানের মাধ্যমে আবর্জনা সংগ্রহ পদ্ধতি চালু হয়েছে। প্রত্যহ সারাদিন বাসায় বাসায় গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে বিকেলে নির্ধারিত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে (এসটিএস) বা নির্ধারিত স্থানে ফেলা হচ্ছে। বর্জ্যবাহী গাড়িগুলো রাতের বেলায় সেখান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে ল্যান্ডফিলে নিয়ে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন নগরীতে উৎপাদিত বর্জ্যের অন্তত ৯০ শতাংশ সংগ্রহ করতে পারছে। শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে নগরবাসীরও সহযোগিতা প্রয়োজন। একসময় বর্জ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে পরিমাণ কমিয়ে তা ফেলা হত ভাগাড়ে। এটিকে থ্রি-আর (রি-থিংকিং, রি-ফিউজিং ও রিডিউসিং) প্রযুক্তি বলা হয়। আর বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনগুলো সঠিকভাবে থ্রি-আর প্রযুক্তিও ব্যবহার করছেনা। ফলে মাটি, বাতাস ও পানির দূষণ ঘটছে প্রতিনিয়ত। অপচয় হচ্ছে ভূমিরও। যেখানে উন্নত দেশগুলো বর্জ্য পুড়িয়ে এর অবশিষ্ট অংশ ব্যবহার এবং চূড়ান্তভাবে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে ফাইভ-আর (থ্রি-আর এবং রি-ইউজিং ও রিসাইক্লিং) পদ্ধতি ব্যবহার করছে বেশ গুরুত্ব সহকারে। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে প্রযুক্তির সঠিক এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়। তরুণদের মেধা-মননকে কাজে লাগিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিরবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তবেই প্রজন্মের কাছে সুস্থ-সুন্দর-সবুজ পৃথিবী তুলে দিতে পারব আমরা। জীর্ণতাকে দূরে ঠেলে তারাই গড়বে সুন্দর ভবিষ্যৎ।

তাই তো নোবেলজয়ী (১৯১৩) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর সবুজের অভিযান কবিতায় লিখেছেন– 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' অর্থাৎ দুর্বল বর্জ্য সংগ্রহ ও যথাযথ প্রক্রিয়াকরণে ব্যর্থতাকে দূরে ঠেলে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার উদ্ভাবনী কৌশল হিসেবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণই এখন সময়ের দাবি।

নগর বা পৌরএলাকার কঠিন বর্জ্যের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য সরকার বিভিন্ন সময় জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কৌশল, নীতিমালা, আইন ও বিধি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত-না উন্মুক্ত অঞ্চল, নদী ও বন্যা-ঝুঁকিযুক্ত এলাকা কঠিন বর্জ্য ফেলা থেকে মুক্ত করে;

পুনঃব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎসমুখ থেকে কঠিন বর্জ্যকে উপাদান অনুযায়ী পৃথক করার সঠিক ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদির 'বাজার' তৈরি এবং কঠিন বর্জ্য পুনঃব্যবহার করাকে উৎসাহী করতে স্তর অনুযায়ী অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহালচিত্র দেখে দুর্ভোগ পোহাতেই হবে।

সবশেষে বলতে পারি, বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের নতুন সৃষ্টির প্রতি যতটা প্রলুব্ধ করেছে ঠিক ততটাই তরুণদের ভাবনা এবং উদ্দীপনার জয়ধ্বনি আন্দোলিত করেছে। সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেই বিশ্বব্যাপী তরুণেরা আজ বর্জ্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে হাতে হাত রেখে কাজ করতে এগিয়ে আসছে। আর নতুনের জয়গানে বর্জ্যমুক্ত সবুজ পৃথিবী গড়তে জাতিসংঘ এবং প্রতিটি দেশের সরকারের পাশাপাশি আমরা সাধারণ মানুষও যদি এগিয়ে আসি তবে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁর 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নতুনের গান কবিতায় লিখেছেন– 'নব-নবীনের গাহিয়া গান/সবুজ করিব মহাশ্মশান,/আমরা দানিব নূতন প্রাণ,/বাহুতে নবীণ বল।'

কবির লেখনীর পরশেই বোধকরি, আমরা দেখছি প্রজন্ম এখন অনেক সচেতন। তাদের ভাবনা, উদ্দামতা আর প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই একটি সবুজ পৃথিবীর সোনালি স্বপ্ন রচনা করতে পারব।

[লেখক : কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নারীনেত্রী।]

বর্জ্য থেকে পরিবেশ বিপর্যয়

ফে র দৌ সী সু ল তা না

আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশে। সে সময় আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম। মুরুব্বিরা নামাজ পড়তে মসজিদে যেতেন আর আমরা ফাঁকা রাস্তায় আরামসে ছোটাছুটি করতাম। এসময় কেবল পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ঝাড়ু দিত আর ময়লা আবর্জনা নিয়ে যাবার জন্যে পৌরসভার গাড়ি আসত। ফজরের নামাজের পর দল বেঁধে মসজিদে যেতাম কোরান-ছিপাড়া-কায়দা হাতে। মসজিদে ঐসময় নামাজও শেখানো হত। ফেরার সময় দেখতাম রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এসব পরিচ্ছন্ন কর্মীদের এবং পৌরসভার ময়লা আবর্জনা বহনকারী গাড়ি আর ভোরে দেখা গেল না। স্বাধীনতা-উত্তর কয়েক মাস সঙ্গত কারণেই সবক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আবার সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই নিয়মের মধ্যে চলে আসে। শুধু সময় পরিবর্তন হয় ময়লা আবর্জনা বহনকারী গাড়ি আর পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজের সময়সূচির। তারা দিব্যি সকাল নয়টা-দশটায় স্কুলগামী বাচ্চা-ছেলে-মেয়ে, অফিসগামী মানুষ এবং বিভিন্ন শ্রমজীবী কর্মজীবী মানুষের নাকে-মুখে ধুলা উড়িয়ে রাস্তা ঝাড়ু দিতে লাগল এবং ময়লা আবর্জনা বহনকারী গাড়ি ময়লা সংগ্রহ করতে শুরু করল। শোনা কথা, তারা নাকি বায়না ধরেছিল স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে রাতে ঘুমানো এবং দিনে কাজ করার অধিকার তাদেরও জন্মেছে। সুতরাং সময়সূচির পরিবর্তন, নইলে কর্মবিরতির হুমকি। সারাদেশেই একযোগে কাজ বন্ধ করে দেবার জন্যে তারা জোটবদ্ধ হয়ে যায়। নতি স্বীকার পৌরসভার চেয়ারম্যানদের আর বড় শহরের মেয়রদের। সেই শুরু, আর এখনো তা বহাল আছে।

ভাগ্যিস নৈশপ্রহরীরা বলেনি, আমরাও রাতে ঘুমাব আর রাতে পাহারা দেবার কাজটি দিনেই সেরে নেব। আবর্জনা বা বর্জ্য আসলে কাকে বলি আমরা? আমাদের দৈনন্দিন কাজে যা কিছু ব্যবহার্য তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তা বর্জন করি আমরা। যেমন: এই কলমটি দিয়ে লিখছি, এর কালি শেষ হয়ে গেলেই এর প্রয়োজন শেষ, তখন এটি ফেলে দেব বা বর্জন করব। টেলিভিশন দেখছি, নষ্ট হলেই এটি বর্জন করব, মোবাইল ফোনটি নষ্ট হলেই বর্জন করব, এই যে কম্পিউটার দিয়ে টাইপ করছি এর মেয়াদ শেষ হলেই এটিকে পরিত্যাগ করতে হবে, এটিও হবে বর্জনীয়, বর্জ্য। খাবার জিনিসেও তাই। আম কেটে খোসা ফেল, আঁটি ফেলে দাও, এগুলো বর্জনীয়। রান্নাঘরে আনাজ তরকারি কুটে খোসা ফেলে দাও। মাছের আঁশ, মুরগির চামড়া বর্জন কর, বর্জ্য। কিন্তু এই বর্জ্য আমরা কোথায় ফেলি? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি,

খিদে লাগল, দোকান থেকে কলা কিনে খেলাম, খোসা ফেলে দিলাম পথে। অথবা পার্কে বসে ঝালমুড়ি কিনে খেয়ে ছুড়ে ফেলি কাগজের ঠোঙ্গা। সবাই ফেলছি, কিছু-না-কিছু ফেলছি তো।

আমাদের এপার্টমেন্টে গার্বেজ শ্যুটার আছে। যখনি ময়লা জমছে পলিথিনে মুড়িয়ে গার্বেজ শ্যুটারে ফেলে দিচ্ছি, এগুলো নিচে নির্দিষ্ট স্থানে জমা হচ্ছে। দিনে একবার ঐ জমানো ময়লা সিটি করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসা হচ্ছে। এখান থেকেই তো সমস্যার শুরু। ময়লা চারদিকের বাড়ি আর এপার্টমেন্ট থেকে এসে জমছে কিন্তু সিটি করপোরেশন থেকে নিয়মিত ময়লা সংগ্রহের গাড়ি আসছে না। ময়লা সংগ্রহ হচ্ছে না। ময়লা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, মশামাছি বংশবৃদ্ধি করছে, রোগজীবাণু ছড়াচ্ছে। চারপাশের বাতাস দূষিত হয়ে পড়ছে। বলে রাখি, গ্রামের চাইতে শহরে এই সমস্যা বেশি।

ইউএনএফপি (UNFP)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের নবম জনবহুল এবং বিশতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আর ঢাকা হল বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ সিটিগুলোর অন্যতম এবং বর্জ্য নিষ্কাশন সমস্যায় জর্জরিত। ইউএনএফপি-এর ২০১২-এর সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ২২.৪ মিলিয়ন টন বর্জ্য তৈরি হয়, সে হিসাবে ১৯২৫ সাল নাগাদ প্রতিদিন ৪৭০৬৪ টন বর্জ্য তৈরি হবে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ বর্জ্য নিষ্কাশন সেবা থেকে বঞ্চিত যা ভবিষ্যতে ভয়ংকর সমস্যার জন্ম দেবে।

ঢাকা শহরের বর্জ্যের মধ্যে মাত্র ৩৭% বর্জ্য অপসারিত হয়, বাকি বর্জ্য ডাস্টবিনে পড়ে থাকে। কিছু বর্জ্য এখানে-সেখানে নিক্ষিপ্ত বা বিস্তৃতভাবে পড়ে থাকে যা পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর এবং স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

রাজধানী ঢাকার রাজপথের পাশে বর্জ্যের স্তূপ জমে পাহাড় হয়ে থাকে যা চলার পথে প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে পড়ে। এই বর্জ্য থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় যে, ফুটপাত দিয়ে হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি চলন্ত গাড়িতেও দুর্গন্ধ ঝাপটা মারে।

বাংলাদেশ জন্মের একদশক আমরা চটের ব্যাগ ব্যবহার করতাম। এরপর ধীরে ধীরে আমরা প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা শুরু করলাম। বলা যায় চটের ব্যাগের জায়গা দখল করে নেয় প্লাস্টিকের ব্যাগ। ফ্রিজে মাছ-মাংস-সবজি রাখার জন্য আমরা পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করি, যা ব্যবহারের পর আবর্জনা হিসেবে ডাস্টবিনে জায়গা করে নেয়। কাঁচাবাজার, শপিং সব জায়গায় পলিথিন ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়ে-আমরা তা নর্দমায়, ড্রেনে, নদীতে কোথায় না ফেলি। পলিথিনের এসব ব্যাগ পচনশীল নয়, বরং এগুলো আমাদের নালার মুখ বন্ধ করে দেয়, ফলে রাস্তায় পানি জমে। নদীর নাব্যতা নষ্ট করতে পলিথিনের জুড়ি নেই। আমরা জেনে, না-জেনে এসব সমস্যা তৈরি করছি। ফলে সমস্যা আরো বাড়ছে। যথাযথ রিসাইক্লিং– অর্থাৎ পুনঃব্যবহার প্রক্রিয়া থাকলে এসব পলিথিন সিটি করপোরেশন সংগ্রহ করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারত আর পানি নিষ্কাশনও নিষ্কণ্টক হত।

এছাড়া রয়েছে শিল্প কারখানার বর্জ্য যা সরাসরি নদীর পানিতে মিশে নদীকে দূষণ করছে।

রাজধানীতে বাড়ছে গাড়ি, ফলে শব্দ দূষণ বাড়ছে, কার্বনও বাতাসে মিশে বায়ুদূষণ করছে।

মোদ্দা কথা হল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ন এবং নাগরিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। আমাদের যাপিত জীবনে আবর্জনা তৈরি অবশ্যম্ভাবী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত নগরায়ন ক্রমবর্ধমান হারে এই বর্জ্য তৈরিতে সহায়ক হচ্ছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেট এই ছয় বড় শহরগুলোই মোট বর্জ্যের ৬৯% বর্জ্য তৈরি করে। ঢাকা শহর একাই তৈরি করে সিংহভাগ বর্জ্য। অর্থনৈতিক অবস্থা, ফলের মওসুম, জলবায়ু, রিসাইক্লিং ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর বর্জ্য উৎপন্ন হওয়ার হার কম-বেশি হয়।

২০১১ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশন দুভাগ হওয়ার পরে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ঢাকাকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, বাসযোগ্য, অত্যাধুনিক এবং ডিজিটাল সিটি করার লক্ষ্যে একযোগে কাজ শুরু করে। সাধারণত ঢাকা উত্তর আমিনবাজারে এবং ঢাকা দক্ষিণ মাতুয়াইলে ময়লা আবর্জনা স্তূপীকরণের জন্য ব্যবহার করে। এই ময়লা আবর্জনাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করতে তারা ব্যর্থ হয়।

সম্প্রতি জাইকা (জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি) ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাথে সলিড আবর্জনা– যাকে আমরা বাসাবাড়ি থেকে উৎপন্ন আবর্জনা বলি ব্যবস্থাপনায় কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ইউনিসেফও এগিয়ে এসেছে রিসাইক্লিং কাজে সিটি করপোরেশনকে সহায়তা দিতে। তা সত্ত্বেও আবর্জনার পাহাড়ের কাছে এসব উদ্যোগ অপর্যাপ্ত বলে আমরা এখনো এর ফল ভোগ করতে পারছি না। এসব কারণেই গ্লোবাল লাইভেবিলিটি র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশের ঢাকা শহর বিশ্বের ১৪০টি সিটির মধ্যে বসবাস-অযোগ্য চতুর্থ শহর।

A wast concern study-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকায় প্রতিদিন বাসাবাড়িতে উৎপন্ন হচ্ছে ৪৫০০ টন বর্জ্য। আর ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ করপোরেশনের দাবি ঢাকায় প্রতিদিন মাত্র ৫০০ টনেরও কম বর্জ্য তৈরি হচ্ছে।

তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বোঝার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, সিলেটে বসবাসকারী নাগরিকের কাছে যাওয়ার দরকার নেই । সাদা চোখে যা দেখা যায় তাতেই আমরা বুঝি, আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যেসব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা অপ্রতুল।

সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও সংখ্যায় অপ্রতুল; এবং বর্তমান কর্মীরাও তাঁদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না।

আমরা আসলে 'রাখে আল্লা মারে কে' এরকম এক অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। আল্লাহতাআলা আমাদের 'কই মাছের জান' দিয়েছেন তাই এখনো বেঁচে-বর্তে আছি।

আমাদের নদীগুলো দূষণ করছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বর্জ্য। আমরা বুড়িগঙ্গার দিকে তাকাই– ঘোলাটে দুর্গন্ধযুক্ত পানি আর এই পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে পলিথিন, কাগজের ঠোঙ্গা আরো যে কত কী! দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। শীতলক্ষা আর তুরাগ নদীও বুড়িগঙ্গা হতে চলেছে। সরকারের ঢিলেঢালা রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শিল্পপতিরা নদীদূষণ করছে আর সম্পদের পাহাড় গড়ছে।

আমি আসলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তাই তথ্য উপাত্ত আর গবেষণাধর্মী লেখাগুলোর ওপর নজর দিয়ে নেতিবাচক চিত্রই দেখলাম। ইতিবাচক পদক্ষেপ এত কম যে মন বিষাদে ভরে গেল।

২) বাংলাদেশের প্রধান ছয়টি শহরে প্রতিদিন ৮০০০ টন বর্জ্য তৈরি হচ্ছে যার ৭০% ই ঢাকা শহরে। বর্জ্য সংগ্রহের জন্য অপর্যাপ্ত গাড়ি যা রয়েছে তার সবই প্রায় উন্মুক্ত, রিসাইক্লিং ব্যবস্থাপনা দুর্বল, বর্জ্য দাহ্যকরণ প্রক্রিয়া সনাতন এবং বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। এদিকে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ– বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব এক কাজ।

ইলেকট্রনিক বর্জ্য

এবার ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। সিটি করপোশেনগুলোর বা পৌরসভাগুলোর ই-বর্জ্যের জন্যে আলাদা কোনো ডাস্টবিন নেই। আম-জাম-কাঁঠাল এবং মাছ-মাংসের

সাথে ই বর্জ্যও ফেলা হয় এবং সংগৃহীত হয়। ই-বর্জ্য কতখানি মারাত্মক এ সম্পর্কে জনগণের কোনো ধারণা নেই; এ নিয়ে সিটি করপোরেশনের সচেতনতামূলক কোনো প্রচারও নেই। বরং বলা যায় তারা নিজেরাও এ সম্পর্কে সঠিক অবগত নয়।

নষ্ট হয়ে যাওয়া টিভি সেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, এয়ার কন্ডিশনার, ফ্যান, প্রিন্টার, স্ক্যানার মেশিন, কফি বানানোর মেশিন, ফটো কপিয়ার মেশিন এমনকি এটিএম মেশিন জাতীয় ই-বর্জ্য আমরা নির্বিবাদে ফেলছি ডাস্টবিনে। এগুলো পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে ই-বর্জ্য পোড়ানো হচ্ছে; কিন্তু মার্কারি, জিঙ্ক, লিড, কেড়িয়াম এজাতীয় রাসায়নিক উপাদানগুলো কিন্তু পুড়ছে না, বরং এগুলো বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশ ভয়ংকর হুমকিতে পড়ছে। এসব রাসায়নিক উপাদান মানবদেহে যেসব ক্ষতি করছে তার মধ্যে কিডনি ড্যামেজ, হাঁপানি, নার্ভাস ব্রেকডাউন, অকালে চুল পড়া, শিশুমৃত্যু, এমনকি পঙ্গু শিশুর জন্ম বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বর্তমানে যে হারে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে, বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ছে কম্পিউটার সেট, প্রিন্টার ইত্যাদি। আর ব্যাংকগুলোর মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ফলে গ্রামে অপ্রতিরোধ্য হারে বাড়ছে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা। পল্লি বিদ্যুতায়নের ফলে এখন অধিকাংশ গ্রাম আর অন্ধকার নেই। ফলে আলোঝলমলে এসব গ্রামে বিজলিবাতি এবং টেলিভিশন ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। ব্যাংকগুলো কিস্তিতে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণসুবিধা দেওয়ায় ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, কম্পিউটার, ওভেন এসব যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার নাগালে এসেছে। এগুলো যখন ব্যবহার-অনুপযোগী হচ্ছে তখন তা ফেলে দেয়া হচ্ছে যেখানে-সেখানে।

উন্নত বিশ্ব ই-বর্জ্যের বিষয়ে খুবই সচেতন। তাদের ই-বর্জ্যের জন্যে আলাদা ডাস্টবিন রয়েছে এবং রয়েছে রিসাইক্লিং ব্যবস্থাও। আমাদের সরকার যদি প্রতিটি ইলেক্ট্রনিক, ডিস্ট্রিবিউটার এবং এজেন্সিগুলোর লিস্ট তৈরি করে তাদের নিজেদের বিক্রিত পণ্য ব্যবহার অনুপযোগী হলে ই-বর্জ্য সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করে দেয় তবে অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। অর্থাৎ আমাদের টিভি, কম্পিউটার, ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, মোবাইল সেট, প্রিন্টার ইত্যাদি ইত্যাদি যখন খারাপ হবে তখন আমরা যে কোম্পানিগুলো থেকে এগুলো ক্রয় করেছি সেখানে জমা দিলে তা তারা ফেরত নিতে বাধ্য হবে; এবং এর জন্যে নির্ধারিত কিছু টাকাও ফেরত পাব, যার সঙ্গে কিছু টাকা জোড়া দিয়ে নতুন সামগ্রীও কিনতে পারব এ-রকম ব্যবস্থা উন্নতবিশ্বে প্রচলিত আছে– তাহলে সমস্যার সিংহভাগ সমাধান হতে পারে।

উন্নত দেশগুলো তাদের বাতিল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীগুলো পুনরায় ব্যবহার উপযোগী (রিসাইক্লিং) করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিক্রয় করে থাকে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশে ৪ লাখ টন ই-বর্জ্য তৈরি হচ্ছে ।

Assesment of Generation of e-wast, its impact of the Environment and Resource Recovery Potential of Bangladesh Rules– সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রতি বছর ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ব্যবহারকারী ২০% হারে বাড়ছে। এ-হারে বাড়লে ২০৩৫ সাল নাগাদ ই-বর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টন। সমীক্ষায় দেখা যায় মাত্র ৩% ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং-এ যায়। অব্যবহৃত ই-বর্জ্য খোলা আকাশের নিচেই দাহ্য করা হয়।

২০১১ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর '১৯৯৫ সালের Environment conservation act E wast Management অ্যাক্ট'-এর অধীনে এক খসড়া (Draft) তৈরি করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। কিছু ঞবপযহরপধষ ঢ়ৎড়নষবস উল্লেখ করে আইন মন্ত্রণালয় তা আবার পরিবেশ অধিদপ্তরে ফেরত পাঠায়। ২০১৭ সালে আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন করে আবার তা পাঠানো হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। জানা যায়, বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত খসড়ায় সরকার ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে ক্যাশব্যাক পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করবে। ফলে ব্যবহারকারীগণ পুরনো ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ফেরত দিলে কোম্পানিগুলো তাদের নগদ অর্থ প্রদান করবে। তবে টাকার পরিমাণ এবং কোন সামগ্রীর জন্য কত অর্থ ক্যাশ ব্যাক করা হবে তা ঐ খসড়ায় উল্লেখ করা হয়নি।

যা হোক ঐ খসড়া বাস্তবায়ন হলে ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর বর্জ্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

নদীমাতৃক দেশ এই বাংলাদেশ। এমনিতেই পলিমাটি জমে নদীগুলো এর নাব্যতা হারাচ্ছে। ঠিকমত ড্রেজিং না হওয়া, বন্যা, অতিবৃষ্টি এসব কারণে নদীতে পলিমাটি জমছে। যেসব নদীর উজানে ভারত বাঁধ দিয়েছে সেগুলোর অবস্থা তো আরো খারাপ। এই নদীগুলো শুকনো মৌসুমে পানিশূন্য থাকলেও বর্ষায় যখন বন্যা বা প্লাবন হয় তখন ভারত বাঁধের গেট খুলে দেয়, আর এসব নদী প্লাবিত হয়ে বাংলাদেশের জনপদ ভাসিয়ে দেয়। এর সাথে 'মরার ওপর খাড়ার ঘা' হল শিল্প বর্জ্য।

আমাদের দেশ আদিকাল থেকেই কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকেরা জমি সেচের পানির জন্য অনেকটাই নদীর ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া অনেকেই নদীর পানিতে গোসল, কাপড় ধোয়া, কখনো হাঁড়িপাতিল ধোয়া এমনকি রান্নার জন্যও নদীর পানি ব্যবহার করে। বহমান স্রোতস্বিনী নদীর পানি পবিত্র মনে করে অনেকে তা পানও করেন। জেলেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বড় বড় নদীতে মাছ ধরেন।

শিল্পবর্জ্যের কারণে এখন কম-বেশি সারা দেশই স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ, নদী বহমান বলে পানি এক জায়গায় স্থির থাকে না, বয়ে চলে। তাই শিল্পবর্জ্যের দূষিত পানি প্রায় প্রতিটি নদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কৃষিনির্ভরতা কমাতে শিল্পায়ন অর্থনীতির জন্য অনিবার্য, একথা অনস্বীকার্য। এমনিতেই আমাদের দেশে অপ্রতুল বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাটের দৈন্যদশা এবং কাঁচামালের সমস্যার কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠাই মুশকিল। এসব প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করে যাঁরা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতা এবং সুবিধা প্রদানের জন্য নিয়মকানুন এবং শিল্পায়ন নীতিমালা তড়িঘড়ি প্রবর্তন করে শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হয়েছে। এজন্য হয়তো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়নি। শিল্পকারখানার বর্জ্য শোধন করার দায়িত্ব কিন্তু শিল্পকারখানার মালিকদেরই– এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক পর্যায়েই। সেটা না করার কারণে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। কঠিন পদার্থ, রাসায়নিক এবং জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলো পানির সাথে মিশে যখন নদীর পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তখন মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে, স্বাভাবিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পশুপাখি এবং গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ, মাছ ও জলজ অন্যান্য প্রাণীর বৃদ্ধিও ব্যহত হচ্ছে। অর্থাৎ এসব বর্জ্য আমাদের নদীর পানি যেমন দূষিত করছে তেমনি পর্যায়ক্রমে আমাদের ভূমি, বায়ু এবং সকল জীবিত প্রাণ; মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালা সবকিছুকে অদূর ভবিষ্যতে হুমকির মুখে ফেলে দেবে।

১৯৮২-৮৩ এর ম্যানুফ্যাকচারিং সুমারি অনুযায়ী নেত্রকোনা, বাগেরহাট, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, কুড়িগ্রাম, মাগুরা, সাতক্ষীরা, শরিয়তপুর, লক্ষ্মীপুর এই ১৩টি জেলা ছাড়া আর বাকি ৫১টি জেলায় ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে।

আগেই বলেছি, এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে যে বর্জ্য নির্গত হয় তা মাটি, পানি এবং বাতাসকে দূষিত করে। এসব বর্জ্যতে টক্সিট থাকায় তা যখন সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহে মিলিত হয় তখন ঐ দূষিত পানি জলজ প্রানিদের জীবন বিপন্ন করে। এছাড়া শিল্পএলাকার চারপাশ ছাই এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকে, এগুলো বাতাসে মিশে বাতাসকেও করে দূষিত।

ট্যানারি বা চামড়া শিল্প, সারকারখানা, কাগজ শিল্প, তেল শোধনাগার, চিনি শিল্প, ওষুধশিল্প, মাছ ও সামুদ্রিক ফুডজাতীয় খাদ্যের প্রসেসিং শিল্প, বস্ত্রশিল্প, উল এবং কটন, পাটশিল্প, সিল্ক এবং সিনথেটিক শিল্প, ডাইয়িং এবং ব্লিচিং শিল্প, পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং, হার্ডবোর্ড এবং কাগজ শিল্প পরিবেশের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ।

মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পের মধ্যে রয়েছে ডেইরি প্রোডাক্ট, ভেজিটেবল অয়েল, চা এবং কফি প্রসেসিং, ইউনানি ও আয়ুর্বেদী ওষুধ, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এবং কেমিক্যাল প্রোডাক্ট, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট, সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, রবার শিল্প ইত্যাদি।

কম ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পের মধ্যে রয়েছে রাইস মিল, গ্রেইন মিল, গ্রেইন মিল প্রোডাক্ট, বেকারি প্রোডাক্ট, সফট ড্রিংক ম্যানুফ্যাকচারিং, হ্যান্ডলুম প্রোডাক্ট, প্লাস্টিক প্রোডাক্ট, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, সিরামিক প্রোডাক্ট, গ্লাস প্রোডাক্ট, ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারিজ, ট্রান্সপোর্ট ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, ফটোগ্রাফিক এন্ড অপটিক্যাল দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

যাহোক, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এবং মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুলোর বেশিরভাগই নদীর খুব কাছাকাছি অবস্থানে গড়ে উঠেছে। কারণ এগুলোতে প্রচুর পানি ব্যবহৃত হয়। পোশাকশিল্পের ডাইয়িং, পলিথিন প্রিন্টিং, সার কারখানা শিল্পগুলো পরিবেশ আইন অমান্য করে নদীর পাশেই বর্জ্য ফেলছে। এসব বর্জ্যে রয়েছে টক্সিট ওয়াস্ট, ডিটারজেন্ট, কেমিক্যাল ডাইয়িং, এমোনিয়া, লাইম, সালফেট, সুলইউরিক এসিড, সোডা, ব্লিচিং পাউডার, ফসফেট, হাইড্রোজেন সালফাইড, সোডিয়াম পলি সালফেট, হাইড্রোজেন সায়ানাইট, ম্যাথানল, আর্সেনিক, এসিড এন্ড একালিক, ইউরিয়া, ফ্লোরাইড, সোডিয়াম পলি সালফেট, জিংক ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক যা জলজ প্রাণী, মাছ, পশুপাখি এবং মানবস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সব বর্জ্য নদীতে মেশার ফলে মৎস্যসম্পদ বিপন্ন, বলা যায় নদীগুলো থেকে মাছ প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। শীতলক্ষা, ব্রহ্মপুত্র, তুরাগ নদী সরাসরি দূষিত হচ্ছে এবং এই নদীগুলোর সাথে যেসব শাখানদী রয়েছে সেগুলোও দূষিত হচ্ছে। আশার কথা হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্পকারখানার মালিকদের পরিবেশ দূষণ বন্ধের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) চালুর নির্দেশ দিয়েছে। যেসব কারখানা আইন অমান্য করে ইটিপি বা বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু না করবে তাদের ধরার জন্যে মোবাইল কোর্টেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে ৬৫ ফ্যাক্টরি ইটিপি স্থাপন করেছে এবং বাকি ফ্যাক্টরিগুলোও অল্প সময়ের মধ্যে তা স্থাপন করবে।

আমাদের উৎপাদিত বর্জ্য আমাদেরকেই ধ্বংস করে দেবে যদি-না আমরা এর প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করি। যেসব ফ্যাক্টরি ইটিপি স্থাপন করেনি বা যাদের ইটিপি স্থাপন করার পর্যাপ্ত জায়গা নেই বা আর্থিক সংকটের কারণে ইটিপি স্থাপন করতে বিলম্ব হচ্ছে তাদের উৎপাদন কিন্তু থেমে নেই। ফ্যাক্টরি চলছে, সুতরাং বর্জ্যও নির্গত হচ্ছে।

২৫ আগস্ট ২০১৯ প্রথম আলোর ৬নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মজিবুল হকের প্রতিবেদনে 'প্রস্তাবে আটকে আছে কেন্দ্রীয় শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প' পড়ে জেনেছি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় শিল্পবর্জ্যের এক ভয়াবহ চিত্র।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের সদর উপজেলার ফতুল্লায় শতাধিক ফ্যাক্টরি রয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি প্রতিষ্ঠানেরই তরল বর্জ্য শোধনাগার অর্থাৎ ইটিপি নেই।

২০১৫ সালের নভেম্বরে পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জের অফিসের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ফতুল্লায় ডাইয়িং এবং ওয়াশিং প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিন ৫০ হাজার ঘনমিটার তরল বর্জ্য নির্গত হচ্ছে। দূষণের এই হার অনুযায়ী মাসে ১৫ লাখ ঘনমিটার বর্জ্য নির্গত হচ্ছে; বছরে এই বর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৬০ হাজার ঘনমিটার যা সরাসরি বিভিন্ন খাল হয়ে শীতলক্ষা নদীতে পড়ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ঐ প্রতিবেদনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য নির্গমনে প্রধান তিনটি খালকে চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় ইটিপি নির্মাণের প্রস্তাব করে জেলা প্রশাসনকে প্রদান করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের ইটিপি করার সামর্থ্য বা পর্যাপ্ত জমি নেই তাদের সিইটিপি করে সহায়তা করলে নদী ও খালগুলো দূষণমুক্ত হবে এবং নজরদারি করাও সহজ হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি প্রস্তাবই রয়ে গেছে, কোনো কার্যকর পদক্ষেপই নেয়া হয়নি বা এব্যপারে কোনো সিদ্ধান্তও নেয়া হয়নি।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রধান তিনটি খাল হল: সস্তাপুর খাল, হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খাল এবং স্টেডিয়াম পিঠালিপুল খাল ।

সস্তাপুর খাল: সস্তাপুর খাল ফকির রোড ও হাজীগঞ্জ শিবুমার্কেট রোডের সংযোগস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ খালে তরল বর্জ্য নির্গত করছে ১৯ টি ডাইয়িং ও ওয়াশিং প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে মাত্র দুটো প্রতিষ্ঠানের ইটিপি রয়েছে।

হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খাল: হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খালের দুই পাশে ছোট-বড় মিলিয়ে ৬৭ টি ডাইয়িং ও ওয়াশিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের ইটিপি রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্জ্য এই খালে সরাসরি নির্গত হচ্ছে। আবার সস্তাপুর খালের প্রবাহ ফকির রোড ও হাজীগঞ্জ শিবুমার্কেট রোডের সংযোগস্থলে হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই প্রবাহ পিঠালিপুল খাল হয়ে ফতুল্লা স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকের জলাশয়ে মিলিত হয়েছে। ঐ তরল বর্জ্য জালকুড়ি খাল হয়ে কাচপুর সেতু সংলগ্ন খাল দিয়ে শীতলক্ষা নদীতে গিয়ে পড়ছে।

স্টেডিয়াম পিঠালিপুল খাল: স্টেডিয়াম পিঠালিপুল খাল দিয়ে তরল বর্জ্য নির্গত করছে ১০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠানের ইটিপি নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য জালকুড়ি খাল হয়ে সেতু সংলগ্ন খাল দিয়ে শীতলক্ষা নদীতে গিয়ে পড়ছে।

এই বর্জ্য নির্গমন চিত্রটি সামনে রেখে পরিবেশ অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় ইটিপি নির্মাণের তিনটি প্রস্তাব রাখে।

প্রস্তাব ১: সস্তাপুর খালের ১৯টি প্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য, স্টেডিয়াম পিঠালিপুল খালের ১০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য, হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খালের ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য মিলে আনুমানিক ৫০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য নির্গত হচ্ছে। এসব বর্জ্য শোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সেফটি মার্জিন রেখে হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খাল ও শীতলক্ষা নদীর সংযোগস্থলে একটি কেন্দ্রীয় ইটিপি নির্মাণ করা হলে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ নদীদূষণ কমে আসবে। সেক্ষেত্রে এই তিনটি খাল পুনঃখনন, পুনঃসংযোগ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

প্রস্তাব ২: সস্তাপুর খালের প্রবাহ ফকির রোড ও হাজীগঞ্জ শিবুমার্কেট রোডের সংযোগস্থলে হাজীগঞ্জ-দাপা-ইদ্রাকপুর খালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ঐ মিলিত প্রবাহ পিঠালিপুল খাল হয়ে ফতুল্লা স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকের জলাশয়ে মিলিত হয়েছে। অপরদিকে স্টেডিয়াম পিঠালিপুল খালের ১০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্যও স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে লিংক রোডের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকের জলাশয়ে মিলিত হয়েছে। উভয় প্রবাহ জালকুড়ি খাল হয়ে কাচপুর সেতু সংলগ্ন খাল দিয়ে শীতলক্ষা নদীতে গিয়ে পড়ছে। যেহেতু ৯০ শতাংশ তরল বর্জ্য কাচপুর সেতু সংলগ্ন খাল দিয়ে বর্তমানে শীতলক্ষা নদীতে নির্গত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কাচপুর সেতু সংলগ্ন সরকারি জায়গায় একটি কেন্দ্রীয় ইটিপি নির্মাণ করা যেতে পারে।

প্রস্তাব ৩: অন্যান্য অপ্রধান খাল বা ড্রেন দিয়ে অল্প পরিমাণে নির্গত তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান খাল বা ড্রেন দিয়ে তরল বর্জ্য নির্গমন বন্ধ করে দিয়ে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবহন বা পৃথক ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ইটিপিতে নেয়া যেতে পারে।

এটা প্রতীয়মান হয় যে, এলাকাভিত্তিক সেন্ট্রাল ইটিপি স্থাপন করলেই কেবল এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি, আমাদের পরিবেশ তথা নদীগুলোকে দূষণমুক্ত করতে পারি। দেখা যাচ্ছে, বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ইটিপি ব্যবহার করলেও ছোট প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তা না করে তাদের প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট বর্জ্য সরাসরি খাল অথবা নদীতে ফেলছে। সরকার উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় ইটিপি স্থাপন করলে নদী বা খালগুলো দূষণমুক্ত হবে। সরকারের হস্তক্ষেপ এজন্যে দরকার যে, সিইটিপি নির্মাণে সরকারি জমি অথবা ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। ডাইয়িং এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় শোধনাগারের আওতায় এনে তাদের কাছ থেকে মাসিক হারে বিল আদায় করে এই প্রস্তাবগুলোর ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এতে দূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে বলে পরিবেশবাদীগণ মনে করেন।

বাসাবাড়ি থেকে উৎপন্ন বর্জ্য, ই-বর্জ্য এবং শিল্প বর্জ্য– সব বর্জ্যই এখন পর্যন্ত সঠিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। ফলে গোটা বাংলাদেশই ধীরে ধীরে পরিবেশ বিপর্যয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সচেতন নাগরিক সমাজ, সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, এনজিও, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন, পৌর করপোরেশন, স্থানীয় সরকার সর্বোপরি সরকারের উদ্যোগে সম্মিলিত এবং সমন্বিত চেষ্টায় ত্বরিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই পরিবেশ দূষণ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

তথ্যসূত্রঃ

wikipedia
Asian J. Med. Biol. Res. 2015, 1 (1), 114-120
Asian Journal of
Medical and Biological Research
ISSN 2411-4472
www.ebupress.com/journal/ajmbr

Review
Waste generation and management in Bangladesh: An overview
Md. Anwarul Abedin* and M. Jahiruddin
Department of Soil Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
Waste management projects gone to waste: Abu Hayat Mahmud:
Dhaka Tribune, published on 12 February 2018

Department of Environment
'প্রস্তাবে আটকে আছে কেন্দ্রীয় শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প': মজিবুল হক: প্রথম আলো: ২৫ আগস্ট ২০১৯

[লেখক: প্রবন্ধ/নিবন্ধকার, শিশু-কিশোর সাহিত্যিক । অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার । আইনজীবী ।]

ঢাকার বর্জ্য: একটি অসহনীয় অবস্থা

কা জী মো হা ম্ম দ শী শ

[লেখাটি ২০০০ সালের । সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সেই সময়ের ।]

ঢাকার পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় যানযট, বায়ুদূষণ, মশার উপদ্রব, সুপেয় পানির অভাব, অপরিকল্পিত বাড়ি-ঘর-দোকান-পাট নির্মাণ, খাল-বিল-নদী ভরাট ও অবৈধ দখল, রাস্তাঘাট-ফুটপাত দখল অথবা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিষয়ের মতো প্রতিদিন সৃষ্ট ঢাকা শহরের বর্জ্য ও তার নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা আজকের দিনের একটি অপরিহার্য বিষয় । বিষয়টা নিয়ে যদি প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায় তবে একটি ভয়াবহ চিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে । আমরা দেখতে পাব আমরা বাস করছি আবর্জনাময় একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উপর । আর এই আগ্নেয়গিরির উত্থিত বর্জ্য ঢাকাকে বসবাসের অযোগ্য করার আগেই আমাদের করতে হবে অনেককিছু ।

বর্জ্য যা আমরা প্রতিদিন সৃষ্টি করছি বা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে আছে, মানুষের মলমূত্র বা পয়ঃ, রান্না-বান্না ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানি, বৃষ্টির পানি, প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত কঠিন বর্জ্য, বিভিন্ন শিল্প কারখানার বর্জ্য, হাসপাতাল-ক্লিনিকের বর্জ্য ইত্যাদি। আর এইসকল বর্জ্য যেসমস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশন ও পরিশোধন করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

* মল-মূত্র ইত্যাদি: পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।
* রান্না-বান্না ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানি: সারফেস ড্রেন ব্যবস্থা।
* বৃষ্টির পানি: স্টর্ম ওয়াটার বা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা।
* পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যবহৃত কঠিন বর্জ্য, বিভিন্ন শিল্পকারখানার বর্জ্য কঠিন বর্জ্য, ক্লিনিকের বর্জ্য: সলিড ওয়েস্ট বা কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা।

এই যে চার রকম নিষ্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে– এগুলোকে চারটি পৃথক পৃথক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশন করা যেতে পারে। আবার প্রথম তিনটি অর্থাৎ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সারফেস ড্রেন ব্যবস্থা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা একটি মাত্র নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে করা যেতে পারে। কিন্তু কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পৃথকভাবেই করতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশেই তা করা হয়ে থাকে। ঢাকা শহরে এই চারটি ব্যবস্থা পৃথকভাবে করার জন্য নির্ধারিত। আর একাধিক সংস্থার ওপর সে দায়িত্ব দেওয়া আছে। তবে লক্ষ করার বিষয় প্রতিটি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে পৃথকভাবে নিষ্কাশনের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বহুস্থানে ব্যবস্থাগুলো একত্রিত হয়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে আলোচনার আগে ঢাকা শহরে বিভিন্ন বর্জ্যের পরিমাণ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থাদি কিরূপ তা আমরা আলোচনা করতে পারি।

পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা

প্রায় এক কোটি লোকের শহর ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য আধুনিক পরিশোধনের আওতায় আছে। এলাকার দিক দিয়ে শতকরা ৩০% ভাগ এলাকা এবং শতকরা ২০% ভাগ লোক এই পরিশোধনের সুযোগ পেয়ে থাকে। অবশিষ্টদের মধ্যে ৪০% ভাগ লোক তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ সেপটিক ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পয়ঃনিষ্কাশন করে থাকে। বলা দরকার সেপটিক ট্যাঙ্ক এক প্রকার পয়ঃশোধন ব্যবস্থা। যদিও সঠিক ডিজাইন ও ব্যবহারের অভাবে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ সেপটিক ট্যাঙ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না। ঢাকা শহরের বস্তি এলাকা এবং স্বল্প আয়ের লোকের ১৫% ভাগ লোক পিট ল্যাট্রিন/খাটা পায়খানা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ঢাকা শহরের ৭৫% ভাগ লোক কোনো না কোনো প্রকার পয়ঃব্যবস্থার অধীনে আছে। অবশিষ্ট ২৫% ভাগ অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ লাখ লোকের পয়ঃ কোনো প্রকার ব্যবস্থার অধীনে নেই। খোলা, নিচু স্থান অথবা খালবিলে নিষ্কাশিত হয়ে এই বর্জ্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।

সারফেস ড্রেন ব্যবস্থা

ঢাকা শহরে প্রায় ১৫,০০০ কি. মি. সারফেস ড্রেন আছে। এই ড্রেন দিয়ে কেবল রান্না-বান্না ও গৃহস্থালির পানি যাওয়ার কথা এবং পরবর্তীতে নিচু এলাকা দিয়ে খালবিল ও নদীতে নিষ্কাশন হওয়ার কথা। কিন্তু একদিকে পলিথিনসহ বিভিন্ন কঠিন বর্জ্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এই ড্রেনগুলো অনেক সময়েই অকেজো থাকে। অন্যদিকে নিষ্কাশনের মুখ, খালবিল যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে ভরাট হওয়ায় ড্রেনগুলো থেকে যথাযথ পানি নিষ্কাশন হয় না। আবার বহুস্থানে ড্রেনের সাথে সেপটিক ট্যাঙ্কের তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের সংযোগ রয়েছে। ফলে ড্রেনের পানি মাত্রাতিরিক্ত দূষিত হচ্ছে।

বৃষ্টির পানি বা স্টর্ম ওয়াটার নিষ্কাশন ব্যবস্থা

ঢাকা শহরে বছরে প্রায় ছাপান্ন কোটি ঘনমিটার পানি নিষ্কাশিত হয়। এর মধ্যে বৃষ্টির পানি ২৩ কোটি এবং নিত্যদিনের ব্যবহার্য অন্যান্য পানি ৩৩ কোটি। বর্তমানে ঢাকা শহরের ড্রেনের এলাকাধীন ২৬০ বর্গ কি. মি. ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা দরকার। এরমধ্যে পরিকল্পনা অনুসারে ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্ল্যান নেটওয়ার্কের প্রায় ১৫০ বর্গ কি. মি. এলাকায় রয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র এলাকার প্রায় ষাট ভাগ অংশ থেকে বৃষ্টির পানি পরিকল্পনা অনুসারে নিষ্কাশিত হয়।

এই সময় ঢাকা শহর বড় ও মাঝারি আকারের বাইশটি এবং নানা ছোটখাট খাল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ফলে সেই সমস্ত খাল-বিল ও নিচু এলাকা দিয়ে বৃষ্টি ও বন্যার পানি নদীতে গিয়ে পড়ত। কিন্তু যত্রতত্র খাল ভরাট এবং অবৈধ দখলের ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতার। পৃথিবীর কোনো শহরে খাল বন্ধ করে পানির গতিকে রুদ্ধ করা হয় না। বরং পরিকল্পিতভাবে খালগুলো সংস্কার ও উন্নয়ন করে একদিকে পানির প্রবাহকে আরও কার্যকরী করা হয় অন্যদিকে নৌকাভ্রমণ, নানা বিনোদনসহ শহরের পরিবেশ ও সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলা হয়। আকৃষ্ট করা হয় পর্যটকদের।

কঠিন বর্জ্য

কঠিন বর্জ্য বলতে প্রধানত যে সমস্ত বর্জ্য সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে অপসারণ করা হয় আমরা সেগুলোকে বুঝি। ঢাকা শহরে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে তিন হাজার টন এরূপ বর্জ্য জমে। আর সংশ্লিষ্ট সংস্থার অপসারণের ক্ষমতা হল আঠার'শ থেকে দু'হাজার টন। সুতরাং প্রতিদিন অবশিষ্ট কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে চলেছে এবং শহরের বিভিন্ন পাড়ায় বা এলাকায় এলাকাবাসীর নিজেদের উদ্যোগে কঠিন বর্জ্য অপসারণ করা হচ্ছে এবং এটি একটি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এতক্ষণ যেসমস্ত বর্জ্যের কথা বলা হল কম হোক বেশি হোক দক্ষতার সাথে হোক এসমস্ত বর্জ্য কোনো-না-কোনোভাবে একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশন বা অপসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু এমন আরো বর্জ্য রয়েছে যেগুলো পরিবেশকে নষ্ট করে ঢাকাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে।

শিল্পকারখানার বর্জ্য

ঢাকা শহরে তিনশ'টি বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা আছে। এইসমস্ত কলকারখানার তরল ও কঠিন বর্জ্য সরাসরি নদীতে, নিচু জায়গায় ও খাল-খন্দতে নিষ্কাশিত হচ্ছে। হাজারীবাগের পঁচিশ হেক্টর জমির উপর স্থাপিত দু'শ-এর বেশি ট্যানারি থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৬,০০০ ঘনমিটার বিষাক্ত তরল ও কঠিন বর্জ্য

বহুবছর সরাসরি নিকটবর্তী এলাকায় এবং নদীতে নিষ্কাশিত হয়েছে। একইভাবে তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে ১২,০০০ ঘনমিটার অপরিশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশিত হচ্ছে। দু'শত পঞ্চাশটি পলিথিন কারখানা থেকে প্রস্তুতকৃত পলিথিন ব্যাগ প্রতিদিন ঢাকা শহরের ষাট লাখ লোক ব্যবহার করছে যা কঠিন বর্জ্য হিসেবে ঢাকা শহরের পয়ঃ ও ড্রেনেজ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে নিষ্কাশন ব্যবস্থাকেই অকেজো করে তুলছে। এছাড়াও আছে হাজার দেড়েক গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যার টুকরো ছেঁড়া কাপড়সহ টন কে টন কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন।

এইসমস্ত বর্জ্য চারিদিকের নদী বুড়িগঙ্গা-তুরাগ-বালুতে ফেলা হলেও মূলত ফেলা হচ্ছে– বুড়িগঙ্গায়। আর তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমের কামরাঙ্গির চর থেকে পূর্ব-দক্ষিণের চীন মৈত্রী সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে জলযান নোঙ্গর ফেলতে পারে না। কারণ বছরের পর বছর জমাকৃত গলিত বর্জ্য ও আবর্জনা দিয়ে নদীর তীর দশ ফিট পর্যন্ত ভরে গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে হাজার হাজার টন আর্বজনা-ময়লা-তৈলাক্ত কাদা জমা হয়ে জলযানের নোঙর আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা নদী-তীর হারিয়ে ফেলেছে। এছাড়াও প্রতিদিন এই নদীতে অপরিশোধিত দশ হাজার ঘনমিটার তরল শিল্পবর্জ্য ফেলা হচ্ছে।

আরও আছে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মারাত্মক বর্জ্য। ঢাকা শহর এখন ক্লিনিকে ক্লিনিকে ছেয়ে গেছে। এক হিসাবে ধানমন্ডি এলাকায় রয়েছে ষাটেরও বেশি ক্লিনিক। এ সমস্ত ক্লিনিকের বর্জ্য পৃথকভাবে পরিশোধন ও অপসারণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঢাকা শহরের আশেপাশের ক্লিনিক ও হাসপাতালের রোগজীবাণুযুক্ত বর্জ্য, ব্যবহৃত সুচ, স্যালাইন সেট, রক্তের ব্যাগ ফেলা হচ্ছে কাছাকাছি কোনো ডাস্টবিনে। এমনকি অনেক সময় ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তার ধারে, ফুটপাতে, কাছের নালা-নর্দমায় এই বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। ফলে যে স্থান থেকে রোগী সুস্থ হয়ে ফিরছে সেই স্থানের নির্গত বর্জ্য সুস্থ লোককে অসুস্থ করছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা শহরের বর্জ্যনিষ্কাশন/অপসারণের অবস্থা বড়ই করুণ। আগেই বলেছি, আমরা আর্বজনাযুক্ত একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। এখনই সাবধান হতে না পারলে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো না নিলে এক বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ঢাকা পরিত্যক্ত শহর হিসেবে পরিণত হবে। তবুও হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই।

* আমাদের যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে হবে।

* ব্যর্থতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহি করতে হবে।

* অপরিকল্পিতভাবে ঢাকাকে বেড়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

* সকল অবৈধ দখল বন্ধ করতে হবে এবং অবৈধ দখল অপসারণ করতে হবে।

* রাজউকের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট এবং জোনিংম্যাপ অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে পরিকল্পিতভাবে আবাসিক-বাণিজ্যিক শিল্প-কারখানা নির্মাণ করতে হবে।

* সকল শিল্পকারখানাকে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মাত্রা পালন করে বর্জ্য নিষ্কাশন করতে হবে। দরকার হলে পরিশোধন করে দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার পর নিষ্কাশন/অপসারণ করতে হবে।

* গণ-সচেতনতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে।

বর্তমানে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ও অগ্রগতি হলেও এখনও করার আছে অনেককিছু। এসকল কাজ করার জন্য রাজনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে TEAM। আমাদের সকলকে

একসাথে TEAM হিসেবে কাজ করতে হবে। TEAM-এর অর্থ হতে হবে Together Everybody Achieves More. আমরা যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে সকলে একত্রে কাজ করতে পারি তবে নিশ্চয় আমরা কিছুটা হলেও সফল হতে পারব। তা না হলে ঢাকা শহরকে বাঁচাবার সুযোগ ও সময় আমরা আর না-ও পেতে পারি।

সংগ্রহসূত্র: গ্রন্থ: বেঁচে থাকার পরিবেশ। প্রকাশকাল: মাঘ ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রকাশনী: জনান্তিক, ঢাকা।

[লেখক: সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, প্রাক্তন প্রকৌশলী।]

প্র ব ন্ধ

পুনঃপ্রক্রিয়াজাত বর্জ্য ফিরিয়ে দিতে পারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নির্মল পরিবেশ

মো. আ মি নূ র র হ মা ন

বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল রাষ্ট্র এবং দশম ঘনবসতি পূর্ণ একটি দেশ। ফলে দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে বেড়ে চলছে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাও। বর্তমানে বাংলাদেশে বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ২২.৪ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ মাথাপিছু ১৫০ কিলোগ্রাম। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সালে দৈনিক প্রায় ৪৭ হাজার ৬৪ টন বর্জ্য উৎপন্ন হবে। এতে করে মাথাপিছু হার বাড়বে ২২০ কিলোগ্রাম। ফলে এখনি প্রয়োজন সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া। বিশাল জনসংখ্যার দেশে অধিকাংশেরই সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে। দেশের বর্জ্যের ৩৭ ভাগ উৎপাদিত হয় রাজধানী ঢাকায়। অথচ সেখানে এখনো পর্যন্ত বর্জ্যের কোনো পরিকল্পিত ব্যবহার নেই। এখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় বর্জ্য সংগ্রহ করে শহরতলীতে রাস্তার পাশে স্তূপ করে জমা করে রাখা। ইউএনএফপি-র মতে ঢাকা যে সর্বাধিক দূষিত শহরের একটি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এর অন্যমত প্রধান কারণ।

বহুদিন আগে থেকে মনুষ্যজাতির কর্মকা-ের অঙ্গ হিসেবেই বর্জ্য পদার্থের আগমন লক্ষ করা গিয়েছে। কিন্তু সে দিনের বর্জ্যসমূহ ছিল (ভঙ্গুর বায়ো ডিগ্রেডেবল) তাই সেগুলো প্রকৃতির নিয়ম ধরেই পুনরাবর্তিত হত। কিন্তু শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী যুগে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং জীবনযাপনকে আরও সহজ, ভোগ্য ও আধুনিকভাবে পরিচালিত করায় প্রকৃতিতে বেড়েছে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অভঙ্গুর (নন বায়ো ডিগ্রেডেবল) বর্জ্য। প্রতিদিনই বেড়ে চলা এই বর্জ্য মোকাবেলাই এখন পরিবেশ রক্ষার অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কারণ বিপুল পরিমাণ আবর্জনার বোঝা বিপন্ন করে চলেছে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে। বিঘ্ন ঘটাচ্ছে জীবমণ্ডলের স্থিতিব্যবস্থা।

বর্জ্য কাকে বলে

খুব সহজভাবে বললে এটাই বোঝায় যে, মানুষ যখন কোনো বস্তুকে বর্জন করে সেটাই বর্জ্য। এই বর্জ্য মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই ক্ষতি করে।

এখন বর্জ্য ক্ষতির দিকটি আলোচনা করার আগে একনজরে দেখে নেওয়া ভালো এর উৎসের দিকটি।

এর মূল উৎস– কারখানার বর্জ্য, কৃষিজমির বর্জ্য, ঘর-গৃহস্থালির বর্জ্য, চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য এবং গ্রাম অথবা পৌরবসতির বর্জ্য। তাই শুধু প্লাস্টিক নয়, বর্জ্যের তালিকায় রয়েছে অনেক কিছুই।

বর্জ্যের দ্বারা জনস্বাস্থ্যের হানি এবং পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া

ক। কঠিন বর্জ্য বস্তু (যেমন প্লাস্টিক, জঞ্জাল, রাবিশ, স্ল্যাগ, ছাই ইত্যাদি) বহুদিন ফেলে রাখলে জল ও মাটি দূষিত হয়।

খ। কঠিন বর্জ্যপদার্থ থেকে টাইফয়েড, জন্ডিস, আন্ত্রিক, কলেরা, ধনুষ্টঙ্কার, চর্মরোগ, কৃমি, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদি হতে পারে।

গ। পচা আবর্জনা দুর্গন্ধ ছড়ায়, বায়ুদূষণ করে।

ঘ। কঠিন বর্জ্য বায়ুদূষণ ঘটায় এবং অবশ্যই দৃশ্যদূষণ ঘটায় ও সৌন্দর্যের হানি ঘটায়।

বর্জ্যের পুনঃব্যবহার

ক। জৈব বর্জ্য পদার্থ থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়।

খ। অদাহ্য পদার্থ যেমন কাচ ও অন্যান্য ধাতুর ভাঙা টুকরোগুলো আলাদা করে তাদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।

গ। প্লাস্টিক পলিথিন জাতীয় পদার্থকে কিছুতেই পোড়ানো উচিত নয়, কারণ এতে বায়ুদূষণ ঘটে। তাই তাদের পুনঃব্যবহার প্রয়োজন।

ঘ। জৈব গ্যাস থেকে দাহ্য গ্যাস তৈরি কার যায় এবং জ্বালানি উৎপাদন করা যায়। বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির ভাবনাটি বাস্তব রূপ দেয়াই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এখন দুটো কথা ভীষণভাবে প্রচলিত। প্রথমটি, আজকের বর্জ্যপদার্থ আগামী কালের সম্পদ। দ্বিতীয়টি, আবর্জনার নগদ অর্থ। এভাবেই ভাবতে হবে, নইলে যে মানবজাতি একদিন আবর্জনার তলে চাপা পড়বে।

বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোগ

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো আমাদের দেশেও অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা হচ্ছে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে দিন দিন বেড়ে চলেছে শত শত টন বর্জ্য যা এই সমস্যাকে প্রকট করে তুলছে। ফলে বায়ুদূষণ, পানিদূষণের মত সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে; সৃষ্টি করছে মারাত্মক সব রোগের। যথাযথভাবে বর্জ্য সংগ্রহ করতে না পারা, সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকা এবং তা পুনঃব্যবহারযোগ্য করতে না পারার কারণে এসব বর্জ্য দূষিত হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামের মতো শহরগুলোতে বর্জ্যের কারণে সৃষ্ট দূষণসমস্যা আরো বেশি, কেননা এসব অঞ্চলে জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ার সাথে সাথে বর্জ্যও তৈরি হচ্ছে অধিক হারে। তবে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে বর্জ্যসম্পদে সহজেই পরিণত করা যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ, সার, গ্যাস তৈরির পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে, বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবেই পরিবেশকে দূষিত করে। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, এইসব পদার্থকে জীবন থেকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং সবসময় চেষ্টা করা দরকার যে, কীভাবে এইসব পদার্থকে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক চক্রের একটি কার্যকরী উপাদান করে নেওয়া যায়। এজন্য বর্জ্য পদার্থগুলোকে শুধু মাত্র অপসারণ বা স্থানান্তরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করে প্রয়োজনমতো এগুলোর পরিমাণহ্রাস, পুনঃব্যবহার করার মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। আর এটাই হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management)। প্রকৃতপক্ষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই মূল ভিত্তি হল এই তিনটি R, যথা Reduce, (পরিমাণহ্রাস), Reuse (পুনর্ব্যবহার), Recycle (পুনর্নবীকরণ)। অর্থাৎ এই তিনভাবে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়।

১। বর্জ্যের পরিমাণহ্রাস

গৃহস্থালি, কলকারখানা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যাতে বেশি বর্জ্য তৈরি না হয়, তাই জিনিসের ব্যবহার কমানো, জিনিস অপচয় না করা, জীবনযাত্রার মান পালটে চাহিদাকে সীমিত রাখা, ব্যবহৃত জিনিস সরাসরি ফেলে না দিয়ে জমিয়ে রাখা– ইত্যাদির মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

২। পুনর্ব্যবহার

কোনো পরিবর্তন না করে বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করলে তাকে বলা হয় পুনর্ব্যবহার। যেমন– ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে খেলনা, ঘর সাজানো জিনিস, লেখার সামগ্রী প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

৩। পুনর্নবীকরণ

এই পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থকে পুনরায় প্রক্রিয়াকরণ বা পুনরাবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। এর ফলে একই দ্রব্য বা নতুন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। যেমন– লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীসমূহ ব্যবহারের ফলে অকেজো হয়ে গেলেও পুনরায় গলিয়ে নতুন লৌহ, ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী প্রস্তুত করে ব্যবহার করা যায়।

বর্জ্য পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বর্জ্য পদার্থ তিন প্রকার- ১। কঠিন, ২। তরল ও ৩। গ্যাসীয়। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এই ধরনের বর্জ্য অপসারণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলিত পদ্ধতি:

বর্জ্য পৃথককরণ

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম পর্যায়টি হল বর্জ্যের পৃথকীকরণ। প্রকৃতির সঙ্গে বর্জ্য পদার্থ প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কঠিন বর্জ্য পদার্থসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– জৈব ভঙ্গুর এবং জৈব অভঙ্গুর।

১। জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ

উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত সব বর্জ্য পদার্থই জৈব ভঙ্গুর বা জীব বিশ্লেষ্য। জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ হল সেইসব বর্জ্য পদার্থ যেগুলো যে কোনো ধরনের অনুজীব দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়। জৈব পদার্থকে ভাঙা বিশ্লেষণের জন্য প্রকৃতিতে হাজার হাজার প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রভৃতি আছে। এরা জটিল জৈব পদার্থকে ভেঙে সরল যৌগে রূপান্তরিত করে সেগুলোকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী গড়ে তোলে এবং এইভাবে বর্জ্য পদার্থ পরিবেশকে রক্ষা করে। মাটি ও জলভাগে এইসব অনুজীব না থাকলে বোধ হয় পৃথিবীতে কোনো জীবই টিকে থাকতে পারত না। এরা আমাদের বন্ধু।

২। জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ

মানুষের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পলিমার, যেমন প্লাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতি ডি.ডি.টি-র মতো বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, কাচ ইত্যাদি জৈব অভঙ্গুর অর্থাৎ এগুলোকে জৈবিক পদ্ধতিতে ভাঙা যায় না। যুগ যুগ ধরে এরা অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। অথচ প্রতিনিয়তই আমরা পরিবেশে এসব ক্ষতিকর বর্জ্য যুক্ত করে যাচ্ছি। যা আমাদেরই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩। ভরাটকরণ

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক স্তর কঠিন জৈব বর্জ্য এবং এক স্তর মাটি দিয়ে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলো পশুর আবাস তৈরি করা হয়। তবে সবার উপরে থাকে একটি পুরু মাটির স্তর। মাটির নিচে থাকা এই বর্জ্যগুলো জৈব ভঙ্গুর বলে এদের পচন হয় এবং তার ফলে এগুলোর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। এই প্রক্রিয়া চলার সময় এগুলো থেকে- মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন হয়। এগুলোকে ল্যান্ডফিল গ্যাস বলা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হল বর্জ্য পদার্থগুলো মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে বলে বর্জ্যজনিত দূষণে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

৪। কম্পোস্টিং

সহজভাবে বলা যায় কম্পোস্টিং হল জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদনের একটি পদ্ধতি। এভাবে উৎপন্ন জৈব সারে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ফসফেট প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

তরল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা:

১। নিকাশি পদ্ধতি

শহরাঞ্চলের গৃহস্থালির মল-মূত্র মিশ্রিত নোংরা জল পয়ঃপ্রণালী মাধ্যমে শহরে বাইরে গিয়ে কোনো জলাভূমিতে জমা করা হয়। কালো রঙের এই তরল বর্জ্যকে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিয়োজিত করে। এরপর ঐ তরল বর্জ্য কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। জলাভূমিতে যেসব নীল-সবুজ শৈবাল সেগুলো বর্জ্যের উপাদান এবং সূর্যালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ ঘটায়, এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন উৎপাদন করে। এর ফলে জল পরিণত হয়। আর এইসব উৎপন্ন পরিশ্রুত জল মাছচাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা হয়।

২। স্ক্রাবার

স্ক্রাবার হল একপ্রকার যন্ত্র যার সাহায্যে কলকারখানার নির্গত দূষিত বায়ু পরিশ্রুত করা হয়। সাধারণত কারখানা থেকে যে বায়ু নির্গত হয় তার মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, ভারী ধাতুকণা প্রভৃতি থেকে স্ক্রাবারের সাহায্যে ওগুলো সহজেই পরিশ্রুত করা যায়। অন্যান্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের সঙ্গে স্ক্রাবারের পার্থক্য হল– এর কাজ বহুমুখী। এটি একইসঙ্গে বায়ুর মধ্যে থাকা ক্ষতিকর কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইসঙ্গে বায়ুকে শীতলও রাখে।

পরিশেষে বলা যায় ঢাকার দুই নগর অফিসের হিসাব বলছে দেড় কোটির বেশি মানুষের এই ঢাকাতেই প্রতিদিন অন্তত আট হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য যোগ হয়। ঢাকার পরেই একই এলাকায় বেশিসংখ্যক মানুষের বাস চট্টগ্রামে। বন্দর নগরীতে একসঙ্গে বসবাস করেছেন ৬০ লাখেরও বেশি। এখানে প্রতিদিন উৎপাদিত হয় দুই হাজার ২০০ থেকে দুই হাজার ৫০০ টন বর্জ্য। প্রতি এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎপ্ল্যান্ট চালানের জন্য প্রয়োজন হয় ৪০ টন বর্জ্য। এই হিসাবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বর্জ্য দিয়ে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এর বাইরে প্রত্যেক বিভাগীয় শহরের বর্জ্য দিয়ে স্থানীয়ভাবে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। বর্জ্য ফেলার জন্য যেসব ল্যান্ড স্টেশন রয়েছে সেখানে বিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে। ফলে নতুন করে জমিরও দরকার নেই।

অতি সম্প্রতি কুষ্টিয়া পৌরসভার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছোট আকারের হলেও বর্জ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে পৌরসভাটি। এখানে কেন্দ্রটি নির্মাণ করবে অস্ট্রেলীয় ওয়াস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি। কেন্দ্রটি নির্মাণে সাড়ে ৮ কোটি ব্যয় হবে। গড় বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হবে ইউনিট প্রতি ১০ টাকার মতো। কুষ্টিয়া পৌরসভা প্রতিদিন ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। সবকিছু ঠিক থাকলে এটি দেশের প্রথম বর্জ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে পারে। (বৃহস্পতিবার, ২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ) দৈনিক জনকণ্ঠ শেষের পাতা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার ব্যতিক্রমী এক প্রকল্প নিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর। এরই মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রংপুর ও কক্সবাজারে বর্জ্য থেকে দৈনিক ৫০ টন সার উৎপাদিত হচ্ছে। আর এই সার বাসাবাড়ির ছাদের সবজিবাগান ও জমির ফসলে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফেলে দেওয়া বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের জন্য ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মাতুয়াইলে সার কারখানা স্থাপনের কাজ আগামী মাসে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমিনবাজার এলাকায় সার কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রথমদিকে

জানালেও এ ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি। বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের প্রকল্প পরিচালক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (আইন) আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ইতিমধ্যে দেশের চারটি কারখানায় বর্জ্য থেকে সার উৎপাদিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন পেলে দেশের ৬৪ টি জেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এ ছাড়া ফেনীতে সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। আর কিশোরগঞ্জের কারখানা নির্মাণের কাজও শিগগিরই শুরু হবে।

এখান থেকে উৎপাদিত সার দেশের কৃষকসহ সৌখিন বাগানের মালিকরা ব্যবহার করছেন। তিনি জানান, এসব কারখানা থেকে গড়ে দৈনিক ৫০ টন সার উৎপাদিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বাসাবাড়ি ও অন্যান্য উৎস থেকে দেশে প্রতিদিন ২০ হাজার মেট্রিক টন সার তৈরি হয়। আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট বর্জ্যের ৫০ শতাংশ সংগ্রহ করতে পারে। বাকি বর্জ্য নিচু জায়গায়, ড্রেন, রাস্তাঘাটে যত্রতত্র পড়ে থাকে। এতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টিসহ বর্জ্য পচে বায়ু ও পানিদূষণ হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় বর্জ্য অপসারণে দক্ষ নয়।

ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে কঠিন বর্জ্যকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে উন্মুক্ত ডাম্পিং স্টেশনে ফেলে রাখা হয়, যেখানে বর্জ্য পচে প্রচুর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। এ জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে 'ন্যাশনাল থ্রি আর রিডিউস, রিইউজ আন্ড রিসাইকেল) স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' প্রণয়ন করে। এ প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মেয়াদ ২০১৬ জুলাই থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রথমে এই প্রকল্পটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হবে। এটি সফল হলে পরিকল্পনা মোতাবেক পরে সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়বে। পরিবেশ অধিদফতরের এই থ্রি আর প্রজেক্টের অধীনে চারটি বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন স্থাপন করা হবে, যার দুটি স্থাপিত হবে নগরীর উত্তর সিটি করপোরেশন, দুটি স্থাপিত হবে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। এর বাইরে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের ৬৪ টি জেলার বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের লক্ষ্যে আরও একটি প্রকল্প 'ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলায় সার কারখানা স্থাপনা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদফতরের প্রতিবেদন মতে পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের শহরগুলোর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে 'প্রোগ্রামাটিক সিডিএম' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিসঃরণ হ্রাস এবং পরিচ্ছন্ন ও বসবাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা। সার্টিফায়েড অ্যামিশন রিডাকশন ও ভেরিফাইড অ্যামিশন রিডাকশন বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জৈব সার ব্যবহার করে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২২-২৫ টন ময়লা এবং ময়মনসিংহ পৌরসভার ৮ থেকে ১০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্ল্যান্ট দুটি বর্তমানে দুটির জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট সার উৎপাদন করে যাচ্ছে। এ ছাড়া রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভায় যথাক্রমে ১৬-২০ টন ও ১২-১৪ টন উৎপাদন ক্ষমতার দুটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট থেকেও সার উৎপাদন হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে বর্জ্য পৃথকীকরণের লক্ষ্যে বাসাবাড়িতে বিতরণের জন্য মোট ১০ হাজার ১৭৪ টি সবুজ (জৈব বর্জ্যের জন্য) ও হলুদ (অজৈব বর্জ্যের জন্য) বিন সরবরাহ করা হয়েছে।

আর সংগৃহীত বর্জ্য পরিবহনের জন্য একটি করে বিশেষ ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে। ট্রাকগুলোতে জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদাভাবে ও আবদ্ধ অবস্থায় পরিবহনের সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় বর্জ্য পৃথকীকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও কম্পোস্ট প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও মনিটরিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদফতর প্রোগ্রামেটিক সিডিএম প্রকল্পের প্রথম পর্বের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্ব গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় পর্বের আওতায় ফেনী ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় দুটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হবে।

[লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ, গাজীপুর।]

প্র ব ন্ধ

পলিথিন ও পুঁজিবাদী পাপ

পা ভে ল পা র্থ

আলাপখানি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে। ছোট্ট এই এত্তটুকুন আলাপ। আলাপের কেন্দ্রে টান মেরেছে পলিথিন। তো আলাপখানি কি পলিথিন নিয়ে? কী জানি কী!

অন্যায়ভাবে পলিথিনের জটলায় আটকে আছে দেশের দম। নালা-খন্দ থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গার মতো ঐতিহাসিক নদীরও নিস্তার নেই পলিথিন থেকে। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে ইফতারি বিক্রি সহ সর্বত্র দেদারসে বিক্রি ও ব্যবহৃত হয় পলিথিন। অথচ পলিথিনের বিরুদ্ধে আইন আছে, আছে প্রশাসন। এ বিষয়ে আছে এক জলজ্যান্ত মন্ত্রণালয়। তাহলে পলিথিন পয়দা হচ্ছে কোথায়? পলিথিনের কাঁচামাল আসছে আর উৎপাদিত পণ্য যাচ্ছে কোথায়? যাচ্ছে মাটির তলায়, জলের শরীরে। সবকিছু আটকে ফেলছে লাগাতার। অল্প বর্ষায় কীভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বারবার ডুবে যাচ্ছে তা তো আমরা ডুবে মরেই বুঝতে পারছি। সম্মানিত মেয়রগণ ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতার বিরুদ্ধে নানা নির্বাচনি দাওয়াই

বিলিয়েছিলেন। কিন্তু এক বিঘৎ বর্জ্যযন্ত্রণা ও জলাবদ্ধতাও কাটাতে পারেননি। কারণ তাঁরা পলিথিনের বিরুদ্ধ দাঁড়াতে পারেননি এখনও।

পলিথিন এক জ্যান্ত পুঁজিবাদী পাপ। নয়া-উদারবাদী বাণিজ্যসাম্রাজ্যের দঃসহ ক্ষত হিসেবে পলিথিন এ সভ্যতাকে গলা টিপে ধরছে বারবার। ১৯৩৩ সনে এই পলিমার পণ্য আবিষ্কৃত হলেও ১৯৫৮ সন থেকে ভোক্তার ক্রয়সীমানা দখল করে নেয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের সূত্রমতে, ১৯৮২ সনে বাংলাদেশে পলিথিন বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার শুরু হয়। পলিথিন গলে না, মিশে না, পচে না। ৫০০ থেকে হাজার বছরে এটি আবারো প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। ২০০২ সনের এক সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা শহরে প্রতিদিন একটি পরিবার গড়ে চারটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করত। পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, ১৯৯৩ সনে বাংলাদেশে দৈনিক ৪৫ লাখ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হত, ২০০০ সালে ৯৩ লাখ। ব্যবসায়ীদের সূত্র দিয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠ জানিয়েছে, চলতি সময়ে বাংলাদেশে দৈনিক এক কোটি ২২ লাখ পলিথিন ব্যবহৃত হচ্ছে (সূত্র: ২১ জুন ২০১৫)। দুনিয়ায় প্রতিবছর প্রায় ৬০ মিলিয়ন টন পলিথিন সামগ্রী তৈরি হয়।

১৯৯৫ সনের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ৬(ক) (সংশোধিত ২০০২) ধারা অনুযায়ী ২০০২ সনের ১ জানুয়ারি ঢাকা শহরে এবং একই সনের ১ মার্চ বাংলাদেশে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয়। পলিথিন নিষিদ্ধকরণ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, *... যেকোনো প্রকার পলিথিন ব্যাগ অর্থাৎ পলিথাইলিন, প্রলিপ্রপাইলিন বা উহার কোনো যৌগ বা মিশ্রণের তৈরি কোনো ব্যাগ, ঠোঙা বা যেকোনো ধারক যাহা কোনো সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় বা কোনো কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায় উহাদের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার দেশে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হইল।*

প্রজ্ঞাপনে বিস্কুট, চানাচুরসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, সিমেন্ট, সার সহ ১৪টি পণ্যের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০২)-এর ১৫(১) অনুচ্ছেদের ৪(ক) ধারায় পলিথিন উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণের জন্য অপরাধীদের সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের কারাদণ্ডের বিধান আছে। আইন অনুযায়ী ১০০ মাইক্রোনের কম পুরুত্বের পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। আইন অমান্যকারীর জন্য ১০ বছরের সশ্রম কারাদ- এবং ১০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। বাজারজাত করলে ৬ মাসের জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা। মাঝেমধ্যে এ আইন মেনে ভ্রাম্যমাণ আদালত 'লোকদেখানো' কিছু জরিমানা আর অভিযান চালালেও পলিথিন থামছে না। পলিথিন যেন আইন, বিচারকাঠামো, সরকার, রাষ্ট্র সবকিছুর চেয়ে শক্তিময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী এক বিস্ময়কর কারণে রাষ্ট্র পলিথিনকে থামাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ২০০২ থেকে ২০১৯ অবধি– একটি দুটি নয় দীর্ঘ ১৭ বছর। এ ১৭ বছরে বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ, ধলেশ্বরী, মেঘনা, পদ্মা, যমুনা, ছোট যমুনা, মনু, সুরমা, কর্ণফুলী নদীসহ শহরের ধারেকাছের নদীপ্রবাহগুলো পলিথিনের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পলিথিন জমতে জমতে নদীর তলা থেকে চামড়া পর্যন্ত দীর্ঘ অভেদ্য স্তর পড়েছে। কোথাও এ স্তর এতই শক্ত যে ভরা বর্ষা মৌসুমেও আটকে যাচ্ছে জলযান।

পলিথিন মাছেদের বিচরণ বিজ্ঞানে বাধা দেয়। শৈবাল, অণুজীবসহ জলজ বাস্তুসংস্থান তছনছ করে ফেলে। জলের তাপমাত্রা, স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, বৈশিষ্ট্য সবকিছু বদলে দেয়। পলিথিন মাটিতে দ্রুত মিশতে পারে না বলে এটি মাটির আভ্যন্তরীণ খাদ্যশৃংখলাকে আঘাত করে। অণুজীব ও মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদ ও

প্রাণীদের সহাবস্থানকে যন্ত্রণাকাতর করে তুলে। ধীরে ধীরে মাটির বৈশিষ্ট্য ও গঠনে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন তৈরি করে। পলিথিন জমে জমে মাটির দীর্ঘ অঞ্চল শস্য ফসল জন্মানোর অনুপযোগী করে ফেলে।

পলিথিনের বিপদ কম বেশি প্রচারিত হলেও পলিথিন বিক্রি হচ্ছে। কোনো একটি পলিথিন কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে আরেকটি চালু হচ্ছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ভারতের মুম্বাই ও হিমাচল প্রদেশ, তাইওয়ান, আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো ও ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য, কানাডা, ইরিত্রিয়া, রুয়ান্ডা, সোমালিয়া, কেনিয়া, উগান্ডায় পলিথিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পলিথিনকে কি থামানো যাচ্ছে? গ্রামের খুদে হাট থেকে শুরু করে বড় শহরের বাণিজ্যবিপণি পর্যন্ত কোথাও? দশম জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পলিথিন বিষয়ে অভিযোগ জমা হতে শোনা যায়। ২০১৪ সনের ২৩ নভেম্বর সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিষিদ্ধ পলিথিনের যত্রতত্র ব্যবহার বন্ধে করণীয় নির্ধারণে ওয়ার্কাস পার্টির সাংসদ টিপু সুলতানকে আহবায়ক করে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল। সাবকমিটি বাজার পরিদর্শন ও কয়েক দফা বৈঠক শেষে পলিথিন নিষিদ্ধকরণে করণীয় সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন মূল কমিটির কাছে জমা দেয়। ২০১৫ সনের ৭ মে মূল কমিটির বৈঠকে প্রতিবেদনটি অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। কিন্তু পলিথিন থামেনি। দুরদার করে সবকিছু চুরমার করে পলিথিন নির্ভয় প্রশ্নহীন বাড়ছে। টিকে থাকছে। পলিথিন টিকে থাকবার অন্যতম কারণ বাজার। চলতি সময়ের করপোরেট কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী বাজারটি সম্প্রসারিত হয়েছে পলিথিনকে কেন্দ্র করে। এই বাজার পলিথিন-উপযোগী। এখানকার পণ্য, ক্রয়বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, ক্রেতা-ভোক্তার রুচি ও চাহিদা, সহজলভ্যতা, লাগাতার ভোগবাদী মনস্তত্ত্ব সবকিছুই মানুষকে পলিথিনমুখী করে তুলে। পলিথিনবিমুখ কোনো জোরদার রাষ্ট্রীয় প্রচারণা এখনো তৈরি হয়নি। অনেকেই বলবেন এখন আগের সেই দিন নেই, পদ্মপাতায় গুড় বা কেচকি মাছ কেউ বেঁধে দেবে না। তাতে যে ক্রেতার সম্মানহানি হবে। কেচকি মাছের গন্ধঅলা পানি পড়ার ভয় বা গুড়ের রস। আজুগি পাতা, শালপাতা, কলাপাতা, শটিপাতা নিয়ে এখন দোকানিরা বসে না। বাজার করতে কেউ বাঁশের খলই, ঝুড়ি, পাটের থলে, নকশা করা কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরুয় না। অবশ্য প্রকৃতিতে এত লতাগুল্ম আর নেই যে এই এত বড় বিশাল বাজারের চাহিদাকে সামাল দিতে পারবে। এখন সবকিছু তাই হয়তো প্যাকেটবন্দি। দোকানের মাংস থেকে ক্রেতা-ভোক্তার মন। সবকিছুই পলিথিনে জড়াতে চায় বা জড়াতে হয়। এ যেন এক অনিবার্য পুঁজিবাদী নিয়তি। পলিথিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে এই অন্যায় পুঁজিবাদী অনিবার্যতাকে প্রশ্ন করতে হবে। ধাক্কা মারতে হবে করপোরেট-নিয়ন্ত্রিত পলিথিনমুখী বাজারকে। তা না হলে প্রাণ-প্রকৃতির মরণ-যন্ত্রণা থেকে রেহাই নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তো কোন ছাড়!

অনেকে পলিথিনের বিরুদ্ধে পাটকে দাঁড় করিয়েছেন। পাটের নানা পদের ব্যাগ আর কাগজের নানা রকমের ঠোঙা। পুরনো পত্র-পত্রিকা আর কাপড়ের নানা কারবারও করছেন অনেকে।

কিন্তু পলিথিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে এসব পরিবেশ-উপযোগী ঠোঙা ও থলে হয়ে ওঠছে ধনীর আরেক শখের কারবারি। দেশের গরিষ্ঠভাগ মেহনতি নিম্নবর্গকে পলিথিনের ভেতর ঠেসে দিয়ে পরিবেশ-উপযোগিতাকে বগলে নিয়ে 'প্রকৃতির নস্টালজিয়াকে' বেচাবিক্রি করবার এই ধরণটি 'বাণিজ্য' হিসেবে

অর্থবহ। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার বিচারে এ-ও তো আরেক অন্যায়। আজ ধনীর যে দুলাল পরিবেশ-উপযোগী পাটের থলে বা কাগজের ব্যাগ হাতে দুলিয়ে অভিজাত বিপণিবিতান থেকে হাসিমুখে বের হয়, তাদের স্মরণে রাখা জরুরি পলিথিন-বাণিজ্য কিন্তু টিকে আছে ধনীদেরই ব্যবসা হিসেবে। গরিবের নয়। করপোরেট দুনিয়া পলিথিন বাজার চায় বলেই এটি চাঙ্গা থাকছে, গরিব শুধু পলিথিন কারখানার মজুর আর প্রশ্নহীন ব্যবহারকারী। কী নির্দয় পরিবেশ-যন্ত্রণা!

প্রাকৃতিক আঁশের সাথে এই ভূগোলের রয়েছে এক ঐতিহাসিক জনসম্পর্ক। বৈচিত্র্যময় পাট প্রাণসম্পদকে ঘিরে পাটচাষি নারী-পুরুষ, পাটকলের শ্রমিক-মালিক, পাট বাজার, ক্রেতা-ভোক্তা মিলিয়ে পাটনির্ভর প্রায় কয়েক কোটি মানুষের যাপিত জীবন থেকে ছিঁড়েখুড়ে উধাও করা হয়েছে পাটের স্মৃতিকথা। বিশ্বব্যাংকের খবরদারিতে সবগুলো জলজ্যান্ত পাটকল দুম করে বন্ধ করে দেয়া হয়।

একদিকে পলিথিন নিষিদ্ধ, আরেকদিকে পাটকলও বন্ধ। ধনীদের না হয় দামি পাটের থলে কি কাগজের নানা পদের ব্যাগ আছে। এসি গাড়ি থেকে নেমে অভিজাত বিপণিবিতান থেকে আবার গাড়িতে। ধনীদের তো আর মেহনতি নিম্নবর্গের মতো পাঙাস মাছ কি ছোট মাছ বা বাজারসদাই করে হেঁটে দৌড়ে ঘাম-গু-মুত ছেনে ঘরে পৌঁছতে হয় না। তাই একটি কাগজের প্যাকেটে ধনী ক্রেতার চাহিদা পূরণ হলেও নিম্নবর্গের কি তা হয়! অথচ নিম্নবর্গের পাটকে নিম্নবর্গের কাছ থেকেই সরিয়ে রাখা হয়েছে। জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য যেমন বাংলাদেশ দায়ী নয়, ঠিক তেমনি পলিথিন-সন্ত্রাসের জন্য দেশের মেহনতি নিম্নবর্গ দায়ী নয়। পুঁজিবাদ এ পাপকে টেনে এনেছে এবং চাঙ্গা করে চলেছে করপোরেট এজেন্সি মালিকেরাই। আইনত এদের বিচার ও শাস্তি হওয়া জরুরি।

পলিথিন রুখতে রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আইন ও জনগণ রাষ্ট্রের পক্ষে আছে। রাষ্ট্র পলিথিন বন্ধে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হবে, এই আশা রাখি। তা না হলে বর্জ্য ব্যবপস্থাপনা বিষয়ে আমরা যত ধরনের আলাপই তুলি না কেন তা পলিথিনজটে দমবন্ধ হবে।

[লেখক: পাভেল পার্থ। লেখক ও গবেষক। animistbangla@yahoo.com]

পলিথিনের সাথে বসবাস নাকি পলিথিনের বিনাশ

কাজী মোহাম্মদ শীশ

[লেখাটি ২০০০ সালের। সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সেই সময়ের।]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির এক ফসল প্লাস্টিক ও পলিথিনের আবিষ্কার, উৎপাদন ও ব্যবহার। অন্য আরও পাঁচটা নতুন বস্তু যার ব্যবহার সহজ, দামে যা সুলভ এবং বস্তুটির প্রয়োজনকে যদি অপরিহার্য করে তোলা যায়– তবে অল্পদিনের মধ্যে তা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এমনই এক বস্তু, প্লাস্টিক সামগ্রী ও পলিথিন ব্যাগ। কিন্তু নিত্যদিনের ব্যক্তিগত সঙ্গী একত্র হয়ে সমগ্র মানবসমাজের শত্রুতে পরিণত হবে– তা তো বন্ধু হিসেবে পলিথিনকে গ্রহণ করার সময় আমাদের জানা ছিল না। আর জানা ছিল না বলেই আজ আমাদের সামনে প্রশ্ন এসেছে পলিথিনের সাথে বসবাস আমরা অটুট রাখব– নাকি তার বিনাশ সাধনই আমাদের সাধনা হবে। উত্তরটা সরাসরি ইতিবাচক বা নেতিবাচক না-ও হতে পারে। তবে সে আলোচনায় যাওয়ার আগে– পলিথিন ও আমাদের দেশে তার ব্যবহারের গোড়ার কথাগুলো জেনে নেওয়া যাক।

পৃথিবীতে পলিথিনের আবিষ্কার ঘটে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৮ সালে প্রথম পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়। আমাদের দেশে পলিথিন কারখানা স্থাপনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৮২ সালে ছোট আকারের মাত্র দু'তিনটি কারখানা পলিথিন উৎপাদন শুরু করে। আজ প্লাস্টিক ও পলিথিনের প্রায় দুই হাজার কারখানা আছে। এর ভেতর প্রায় তিনশটি পলিথিনের কারখানা– যার দু'শত পঞ্চাশটি ঢাকা শহরে এবং তার আশেপাশে রয়েছে। প্রতিদিন দেড়কোটির বেশি বিভিন্ন ধরনের পলিথিন ব্যাগ এই কারখানাগুলো থেকে তৈরি করা হচ্ছে। মাত্র কুড়ি বছরে একদিকে যেমন পলিথিনের বিপুল চাহিদা ও ব্যবহার বেড়েছে অন্যদিকে পরিবেশের জন্য এই বস্তু হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পরিবেশসচেতন ব্যক্তিমাত্র পলিথিনের ব্যবহার নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা বা না করার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে আমাদের আরও কিছু তথ্য জানা দরকার। সারাদেশে ব্যবহৃত প্রতিদিন দেড়কোটি পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ঢাকা শহরেই ব্যবহৃত হয় ষাট লক্ষ। পলিথিন ব্যবহারকারীদের চল্লিশ শতাংশই নিম্নবিত্তের এবং ত্রিশ শতাংশ নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি। পঁচিশ শতাংশ মধ্যবিত্ত এবং পাঁচ শতাংশ উচ্চবিত্ত ও অন্যান্য। লক্ষ করার আরও বিষয় হল প্রতিদিন বাহান্ন শতাংশ লোক বাজার করতে গিয়ে নতুন পলিথিন ব্যাগ কেনে অথবা বিনামূল্যে পেয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যবহৃত পলিথিনের পঞ্চাশ ভাগের ওপর কেবল একবার ব্যবহার করা হয়। পলিব্যাগ রপ্তানি থেকেও কিন্তু বছরে কম বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় না। এর পরিমাণ প্রায় একশত কোটি টাকা।

পলিথিনের ব্যবহারের আগ্রহের কারণ হল এর দাম কম, ওয়াটারপ্রুফ, ওজনে হালকা, সহজলভ্য এবং প্রায়ই একবার ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ওয়ানটাইম ইউজ।

এরপরও পলিথিন কেন ক্ষতির কারণ এবং কী কী ক্ষতি তার দ্বারা হচ্ছে তা আমরা খতিয়ে দেখতে পারি। যে গুণের জন্য পলিথিন ব্যক্তির কাছে সমাদর পায় সেটাই আবার হয়ে ওঠে সমষ্টির জন্য ক্ষতির কারণ। আর তা হল পলিথিন বায়োডেগ্রেডেবল্ নয়। অর্থাৎ পলিথিন পানিতে গলে যায় না, মাটিতে মিশে যায় না। ফলে পলিব্যাগ জমে নগরীর সুয়ের, স্টর্ম সুয়ের, নালার মুখগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক ঢাকা নগরীতে প্রায় একশ কোটি ব্যাগ ভূপৃষ্ঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। খালবিল, নদী-নালায় পলিথিন ব্যাগ জমে থেকে মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর চলাচল, বংশবৃদ্ধি ও জীবন ধারণে বাধা সৃষ্টি করছে। মাটির নিচে জমাকৃত পলিথিন সূর্যালোক প্রবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে মাটির পুষ্টি ও প্রবাহ বৃদ্ধিতে বাধা পায়। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপকারী ব্যাকটেরিয়াসমূহের ক্ষতি করে। আমাদের দেশে মাত্র কুড়ি শতাংশ পলিথিন পুনঃব্যবহার অথবা রিসাইক্লিং করা হচ্ছে। কিন্তু এই রিসাইক্লিং অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। আগুনে পুড়িয়ে পলিথিন মন্ডে পরিণত করা হচ্ছে। পোড়ানোর সময় বিষাক্ত কালো-ধোঁয়ার জন্ম হচ্ছে। পলিথিনের মেল্টিং পয়েন্ট ১২০-১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দহনের সময় বাতাসে কার্বন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনো অক্সাইড নির্গত হয়। কালো-ধোঁয়া ও এই গ্যাসসমূহ বায়ুদূষণ ঘটিয়ে থাকে।

পলিথিনের এইসমস্ত ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন উঠেছে বারবার। আংশিক ও পূর্ণ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই চমকপ্রদ। তা জানানোর আগে পলিথিনের আর একটি ক্ষতির দিক দেখা দরকার। রংয়ের দিক থেকে কালো পলিথিনের ব্যবহার বেশি ক্ষতিকর। কালো পলিথিনে ব্যবহৃত কেমিক্যালস যদি খাদ্য-দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে তবে সেই খাদ্যের ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর, এমনকি ক্যানসারের মতো রোগ হতে পারে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। কিন্তু ব্যবহৃত কেমিক্যালসের দাম কম হওয়ায় পলিথিন প্রস্তুতকারীগণ কালো পলিথিন ব্যাগই বেশি প্রস্তুত করে থাকেন। এখন যে ঘটনাটির কথা বলতে চাই তা হল টেলিভিশনের কোনো এক খবরে দেখা গেল, উচ্চ পর্যায় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলাপ হল। নানা সিদ্ধান্তের মধ্যে অতি সত্বর কালো পলিথিন নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হল। সেদিনেরই পরবর্তী খবরে দেখা গেল, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার সভাপতিত্ব যে মন্ত্রী করেছিলেন তিনি বন্যাদুর্গতদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করছেন পলিথিন ব্যাগে। আর অধিকাংশ পলিথিনই কালো। এ অবস্থায় হয় পলিথিন নিষিদ্ধ নয় পলিথিন ব্যবহার অব্যাহত রাখা এমন একটা শেষ কথা কি আমরা বলতে পারি? আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহার করা হয়। তাই ১৯৯৪ সালে যখন একবার অল্প কিছুদিনের জন্য পলিথিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল– তখন বিদেশি পলিথিনে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের তাগিদে পলিথিনকে পরিবেশ রক্ষা করে উৎপাদন করার নানা গবেষণা চলছে। কিছু কিছু নতুন টেকনোলজি আবিষ্কারও হচ্ছে। এমন একটি টেকনোলজির সাহায্যে ডেগ্রেডেবল পলিথিন তৈরির কথা বলা হচ্ছে। নিউ ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক টেকনোলজি নামে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নাকি এমন পলিথিন ব্যাগ তৈরি হচ্ছে যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজ থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ১৯৯৮ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। আমাদের দেশেও এ প্রযুক্তি এসে যাবে সন্দেহ নেই। তবে কোন নতুন প্রযুক্তি যা আমাদের আবিষ্কৃত নয়– তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানতে পারি প্রযুক্তিটি প্রয়োগের পর।

অতীতে আমরা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান যে প্রযুক্তি আমাদের দিয়েছে– আমরা তাকেই সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এখন সময় এসেছে– যে কোন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের আগে ভবিষ্যতে পরিবেশের ওপর তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা তলিয়ে দেখা। বাজারজাত করার আগে নিউ ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক টেকনোলজি সম্পর্কে এবং পরিবেশের ওপর তা নতুন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবে কিনা– তা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে।

পলিথিন পরিবেশের যে মারাত্মক ক্ষতি করছে– তা সম্পূর্ণ বন্ধ না করতে পারলেও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারি।

* আমাদের দেশের তৈরি অধিকাংশ পলিথিন এতই পাতলা এবং নামমাত্র দামে অথবা বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে আমরা একই পলিথিন ব্যাগ বারবার ব্যবহার না করে প্রতিবারই নতুন ব্যাগ ব্যবহার করি। কালো পলিথিন (আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বড় পুরু ঘনত্বের নয়) বাজারজাত নিষিদ্ধ করে বেশি ঘনত্ব হাতলযুক্ত সুদৃশ্য পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। দাম বেশি হওয়ায় একই ব্যাগ অনেকবার ব্যবহৃত হবে।
* পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের পর যেখানে-সেখানে না ফেলে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার নির্ধারিত স্থানে সকল বর্জ্য পদার্থ, প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ ফেলার ব্যবস্থা করা এবং প্রচারণার মাধ্যমে সে বিষয়ে উৎসাহিত করা।
* পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, ক্লাব/ স্বেচ্ছাসেবী অথবা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাড়িঘর, রাস্তা থেকে ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক ও বর্জ্য সংগ্রহ করা এবং যথাস্থানে ফেলার ব্যবস্থা করা।
* পলিথিন ব্যাগ তৈরির সৃষ্ট প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত গ্যাস এবং পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের কুফলাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো।
* পলিথিনের বিকল্প খুঁজে বের করা। কাগজের ব্যাগ, পাটের তৈরি ব্যাগের ব্যবহার সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে।
* পর্যায়ক্রমে পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য ব্যাপক প্রচার ও জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ।
* ডেগ্রেডেবল পলিথিনের কার্যকারিতা ক্ষতিয়ে দেখা।
* পর্যায়ক্রমে কমিয়ে এনে সম্ভব হলে পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।
* সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সম্ভব না হলে আধুনিক পদ্ধতিতে রিসাইক্লিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

সংগ্রহসূত্র: গ্রন্থ: বেঁচে থাকার পরিবেশ। প্রকাশকাল: মাঘ ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রকাশনী: জনান্তিক, ঢাকা।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, প্রকৌশলী]

প্র ব ন্ধ

ই-বর্জ্য, দিন দিন জমছে; কোথায় এর ভবিষ্যৎ?

চা রু ফে র দৌ সী না ঈ মা ও ম ই না মু ল হ ক

ইতিহাসে পুরাতন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ বলে কথা আছে। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে বলা হয় আধুনিক যুগ। এরপর থেকে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোতে উদ্ভাবন হতে থাকে নতুন নতুন যন্ত্র। তখন বলা হল বিজ্ঞানের যুগ চলছে। তারপর এল ইলেকট্রনিক্স। অত্যন্ত জটিল কিন্তু চমৎকার সব উদ্ভাবন। সবই মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে। আধুনিকতার নামে ঐসব শিল্পপণ্যের ব্যবহার বাড়ল। চাহিদা বাড়ল। কিন্তু তারপর এল রোবট। শিল্প কলকারখানায় মানুষের পরিবর্তে তাদের ব্যবহার। মানুষের কাজ কমে গেল, যন্ত্ররাই করে দেয় অনেক কাজ। অতএব মানুষের অল্প শ্রমে উৎপাদিত পণ্যে বাজার ছয়লাব হয়ে গেল, দাম কমল। শুরু হল পণ্যের বিপুল ব্যবহার। তারপর উৎপাদন বেড়েই চলল। ট্রেন্ড হল: ফেলে দিন, নতুন কিনুন।

কোথা থেকে এ চল বাজারে এল? চল তৈরি করা হল। উৎপাদনকারীরাই পণ্যমূল্যের একটা বড় অঙ্ক

ব্যয় করল প্রচারে, বাজারে চাহিদা তৈরি করতে। নতুন নতুন ব্রান্ডের নতুন নতুন পণ্য। আপনি বসে বসে কী কী পেতে পারেন। খেতে পারেন, পরতে পারেন, শুতে পারেন। বাড়ি থেকে বেরুনোও লাগবে না। বেরুলে কষ্ট নয়, আরামে বেরুবেন; আরামে বসবেন, আরামে খাবেন। উৎপাদননির্ভর এই বিজ্ঞানের যুগ আগে ছিল User যুগ, এখন Consumer যুগ। হাতের কাছে সস্তা মাল চকচকে ও ব্যবহারে সুবিধা, কিন্তু ফেলে দিতে হয় খুব শীঘ্রই। কারণ আসছে নতুন পণ্য, নতুন সুবিধা। তাই ফেলে দিই, ঘরের ভেতরে বা বাহিরে। ঘরে ও বাহিরে জমছে বর্জ্য।

বর্তমান Consumer যুগে কোনো পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিবেচ্য বিষয় নয়, বিবেচ্য বিষয় ত্বরিত কাজ দিচ্ছে কিনা। দিচ্ছে না, তাহলে ফেলে দাও। জমছে বর্জ্য। কারণ যা ফেলে দেয়া হচ্ছে তার প্রায় সবটাই অজৈব পদার্থের তৈরি।

এসব মাটির সাথে মেশে না, বৃষ্টি ও বাতাসে ক্ষয় হয় না, পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস উদগিরণ হয়। তাই বাড়ির পেছনে জমে, সামনে জমে, নয় ভাগাড়ে জমে। জায়গা দখল করে রাখে, বৃষ্টি হলে পানি জমে, তাতে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ার মশা জন্মায়। বাংলাদেশের সকল বড় শহরে, মাঝারি শহরে ও বাজারগুলোর এখানে-সেখানে পড়ে আছে প্লাস্টিকসহ এসব বর্জ্য। ই-বর্জ্যের প্রধান উৎস চীন, অর্থাৎ চীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির নির্মাতা। এদের নেতা বলেছিলেন, ধনী হও। বলেছিলেন, বিড়ালটা সাদা বা কালো তাতে কী আসে-যায়, বিড়ালটা কাজ করে কিনা দেখ। চীনারা কাজ করে, উৎপাদন করে। সারা বিশ্বের বাজারগুলো চীনা পণ্যে সয়লাব হয়ে আছে। চীনারা বিড়াল ধরেছে বটে, কিন্তু তারা কালো বিড়ালই ধরেছে, যা ভূতের মতো কাজ করে চলছে। এখন তাদের কাজ সারা বিশ্বকে বর্জ্যে পরিপূর্ণ করছে। তাদের পণ্য স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু বাজার আছে, চাহিদা আছে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে দেশে দেশে জিডিপি বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানো হচ্ছে। আমদানি হচ্ছে পণ্যের। সরবরাহ করছে চীন। চীনই ই-বর্জ্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। চীনের শিল্প উৎপাদন নীতির কারণেই পৃথিবী বর্জ্য উৎপাদনের বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে

ই-বর্জ্য কী হারে বাড়ছে তার পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই, যদি আমরা কোনো কাজ না করে বসে থাকি। বরং এর কী ব্যবস্থাপনা হবে তা নিয়ে ভাবা দরকার। এই বর্জ্যগুলো শুধুমাত্র জায়গা দখল করে তাই নয়; এসব বর্জ্য পৃথিবীর অনেক মুল্যবান পদার্থ একমুখী পথে নিঃশেষ করে চলছে, তার কি কেউ হিসাব রাখে? কম্পিউটার, মোবাইলে কী কী মূল্যবান কেমিক্যালস থাকে আমরা জানি কি? উন্নয়নের কোনো অর্থই হয় না যদি তা কেবল বর্জ্যই তৈরি করে। অথচ হতেও তো পারত, এসব বর্জ্য এমন ধরনের একটি শৃঙ্খলে গিয়ে পড়ল, যা তাদেরকে করে দিল আরেকটি পণ্যের কাঁচামাল। তা হয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি আমাদের কাছে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে থাকছে।

ঢাকার নিমতলীতে ই-বর্জ্য বাছাইতে নিয়োজিত শিশু শ্রমিক। ছবি-ম ইনামুল হক (আগস্ট ২০১৬)

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য জমা হচ্ছে লাগাতারভাবে। ব্যবস্থাপনা বলে কিছু নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো বাড়ি বা বাগানের আশেপাশে পড়ে থাকে। অনেক ই-বর্জ্য বাড়িতেও জমা থাকে। তবে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় ই-বর্জ্য কিছুটা সংগৃহীত হয়ে হাজারীবাগ, পাটুয়াটুলি, নিমতলি এলাকায় যায়। এখানে মেটাল এবং প্লাস্টিক আলাদা করা হয়। মেটাল শিল্পের কাঁচামাল হয়, প্লাস্টিক ইসলামবাগ অঞ্চলে গলিয়ে ফেলা হয় বা টুকরো করা হয়। গলানো ও টুকরো প্লাস্টিক রুদ্র রোডে পাইকারি হারে বিক্রয় করা হয়। তবে লক্ষ করা যায়, সারা দেশে যে পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে তার একটি অল্প পরিমাণ অংশই এই রিসাইকেল প্রক্রিয়ায় যেতে পারছে।

বাংলাদেশে কী পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপাদন হচ্ছে অনেকে গবেষণা করে পরিসংখ্যান তৈরির চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়নি। ২০১০ সালের এক গবেষণায় হোসেন[১] দেখেছেন, প্রথমে রেডিও তারপর টেলিভিশন ক্রয় সাধারণ মানুষের আগ্রহের প্রধান বিষয় ছিল। শুরুতে পেশাজীবী মানুষেরা ডেস্কটপ কম্পিউটার কিনত, ২০০০ সালের পর থেকে তারা ল্যাপটপ ও মোবাইল সেট কেনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ২০১০ সালের পর শহর এবং গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের ভেতরে মোবাইল এবং টেলিভিশন কেনার হিড়িক পড়ে যায়। ইউসুফ ও রেজা[২] ২০১১ সালের এক গবেষণায় বাংলাদেশ ইলেকট্রিকাল

মেশিনারি মার্কেটিং সমিতির তথ্য নিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩২ লক্ষ ই-বর্জ্য উৎপাদন হয়, যার মধ্যে ২০-৩০% রিসাইকেল হয়।

রহমান এবং অন্যান্যরা[৩] ২০১১ সালে বলছেন, বাংলাদেশে রিসাইকেল করার চাইতে পুনঃব্যবহার বেশি হয়। আহমেদ[৪] ২০১১ সালে বলেন, সত্যিকারের তথ্য প্রকাশ হলে ব্যবসায় বিধিনিষেধ আসার সম্ভাবনা আছে। আলম[৫] ও বাহাউদ্দিন (২০১৫) তাঁদের গবেষণায় লিখেছেন, ২০০৬ সালে কম্পিউটার, টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটর সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ, ১২.৫২ লক্ষ ও ২২ লক্ষ। প্রতি বছর ৫৯.৮৫ লক্ষ টেলিভিশন নষ্ট হত এবং ৮৮,৩৫৭ টন ই-বর্জ্য উৎপাদন হত। সারা দেশে প্রতি বছর ২.৮ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপাদন হত যার ২.৫ মিলিয়ন টনই আসত জাহাজভাঙা থেকে। তাই এ সকল জরিপ বাজার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বুঝেশুনে হওয়া ও প্রকাশ করা দরকার, যাতে চলতি বাজার ব্যবস্থা ও ব্যবসার ক্ষতি না হয়।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা প্রযোজ্য হয়েছে। এর ফলে শিল্পস্থাপনের পূর্বে পরিবেশ ছাড়পত্র নিতে হয়। আমাদের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নীতি এমন থাকা দরকার যে তা বর্জ্য গৃষ্টি হতে দেবে না। ই-বর্জ্যের একটা বড় অংশ প্লাস্টিক বর্জ্য। অতএব নীতিমালা এমন হওয়া দরকার যে, বর্জ্যের সকল প্লাস্টিক ও মেটাল রিসাইকেলের চক্রে এসে যাবে। এমন হতে পারে যে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির একটি বাতিল মূল্য থাকবে, যে মূল্য ঐ সামগ্রীর জীবনমেয়াদ শেষে নির্মাতা কোম্পানিকে ফেরত দিলে ক্রেতা বিনিময়ে পাবে। নির্মাতা বা বাজারজাতকারী কোম্পানি ঐ সামগ্রী জীবনমেয়াদ শেষে ফেরত নিতে বাধ্য থাকবে। তারপর ঐ বাতিল যন্ত্রের রিসাইকেল করার বিষয়টি কোম্পানির নিজ দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।

ই-বর্জ্য প্লাস্টিক বর্জ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার লক্ষে পৃথিবীব্যাপী নানা উদ্যোগ আছে। ঐসব উদ্যোগের যৌক্তিকতা ও ক্রমবর্ধমান ই-বর্জ্যের বিপরীতে তাদের সাফল্য জানা দরকার। আমাদের দেশে ঐসব দেশের কাজ নিয়ে ও তাদের সাফল্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে। আমাদের দেশের ই-বর্জ্য সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে তাদের সাথে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার সুযোগ গৃষ্টি করতে হবে। ই-বর্জ্য শুধু আমাদের দেশের নয়, সারা বিশ্বের সমস্যা। তাই বিশ্ব রিসাইক্লিং ব্যবস্থাতে তাদের অবদান কী পরিমাণ হচ্ছে তা-ও যাচাই করতে হবে। আমাদেরকে আরো জানতে হবে কী কী অর্থনৈতিক বাধা আছে যা তাদের রিসাইক্লিং ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে।

আমাদের পৃথিবী ক্রমবর্ধমান ই-বর্জ্য ও প্লাস্টিক বর্জ্যের ভারে ণ্যুব্জ হয়ে উঠছে। এই চাপ গ্রহণে পৃথিবীর সহনক্ষমতা আর কত, এবং রাষ্ট্রগুলোর আইনি ব্যবস্থা আদৌ এই সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক কিনা তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার। দেশে দেশে ই-বর্জ্য দূরীকরণ ব্যবস্থা বিশ্বায়ন করার উদ্যোগ নেয়া দরকার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রযুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং তাকে বাণিজ্যে পরিণতকরণ করার ব্যাপারেও আমরা বলতে চাই। আমাদের প্রশ্ন, কেন বড় কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ইলেক্ট্রনিক পণ্যগুলো রিসাইকেল করতে উৎসাহী নয়?

আমাদের দেশে এখনও পরিবেশ বাণিজ্য বা পরিবেশ বিনিয়োগ শুরু হয়নি। পরিবেশ রক্ষা সকলের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিবেশ রক্ষার আইন থাকলেও তার প্রয়োগে কড়াকড়ি নেই বলে, ও যথেষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই বলে আমরা নদীর ধারেও দেখি বর্জ্যের স্তূপ। এবং এর বেশিরভাগই পাস্টিক। প্রকৃতি পরিচ্ছন্ন রাখতে কেউ আপনাকে টাকা দেবে না। এতদিন যা ছিল কেবল আপনার নৈতিক দায়িত্ব সেটাকে আমরা বাণিজ্যরূপ দিতে চাই। আমাদের পরিবেশ কঠিন বর্জ্যে ভারী হয়ে উঠছে।

আমাদের অনেকটা জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আপনি কী করবেন, ভাবছেন? আসুন, আমরা মিলিতভাবে ভেবে দেখি। আসুন-না, এই বর্জ্যকে আমরা শক্তি তথা শক্তির কাঁচামালে পরিণত করি। হসপিটাল বর্জ্য, ই-বর্জ্য, প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলে রাখলে চলবে না। হয় কাঁচামাল হবে নয় পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এবং পোড়াতেই যদি হয়, তবে এসব পোড়ানোর সঠিক পথ বের করতে হবে।

সূত্রসমূহঃ

1| Hossain, S.(2010). Study on E-waste: Bangladesh Situation 2010. [online] Dhaka: Environment and Social Development Organization,pp. 8-9 http://ipen.org/sites/default/files/documents/ESDO%20Report%20E-waste%20Bangladesh%20Situation.pdf [Accessed 29 Aug. 2016]

2| Yousuf, T.B., Reza, A. (2011). E-Waste management in Bangladesh: PresentTrend and Future Implication. In: World Congress of International Solid Waste Association. [online] Daegu: ISWA, p.3., DOI: 10.13140/2.1.3261.7927

3| Rahman, H.M., Al-Muyyd, A., and Zuena, A. (2011). E-Waste Management in Bangladesh. In: The 26th International Conference on Solid Waste Technology & Management. [online] Philadelphia: Journal of Solid Waste Technology & Management, p. 1262.

4| Ahmed, S. U. (2011). Informal sector e-waste recycling practices in Bangladesh. [online] Available at:http://www.bdresearch.org.bd/Dhaka: Ananya Raihan, pp. 11,28.

5| Alam, M., Bahauddin, K.M. (2015). Electronic Waste in Bangladesh: Evaluating the Situation, Legislation and Policy and Way Forward with Strategy and Approach. De Gruyter, 9 (1), pp. 81-101.

[লেখক: চারু ফেরদৌসী নাঈমা: পরিচালক, দূষণমুক্ত প্রযুক্তি। জল পরিবেশ ইন্সটিটিউট। ম ইনামুল হক: গবেষক, প্রাবন্ধিক, সংগঠক। Email: jolporibesh@gmail.com]

প্র ব ন্ধ

হাসপাতাল বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

ধ রি ত্রী স র কা র স বু জ

ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব জেলা শহরে, এমনকি উপজেলা শহরেও রয়েছে এক বা একাধিক হাসপাতাল। এর সঙ্গে আছে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এসব হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে প্রতিদিন বের হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ হাসপাতাল-বর্জ্য। এসব বর্জ্যের একটা অংশ ফেলে দেওয়া হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনার বাক্সে। গৃহস্থালি বর্জ্য এবং হাসপাতাল বর্জ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কাক-কুকুর এগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এদিক-সেদিক। এক পর্যায়ে সেগুলো সমাজে রোগ-জীবাণুর বিস্তার ঘটাচ্ছে। আমাদের নিশ্চিতভাবেই বোঝা দরকার, হাসপাতাল-বর্জ্য কোনো সাধারণ বর্জ্য নয়। তাই এ বর্জ্য অপসারণের পদ্ধতিও এমন হওয়া দরকার, যাতে রোগজীবাণু অন্যকোথাও সংক্রমিত হতে না পারে।

হাসপাতাল-বর্জ্য মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হাসপাতালে ব্যবহৃত ব্যান্ডেজ, সিরিঞ্জ, অপারেশন পরবর্তী মানবদেহের অংশবিশেষ বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করে। সেগুলো যদি রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়, তখন বাতাস বা পানির দ্বারা বাহিত হয়েও রোগজীবাণু দূর-দূরান্তে ছড়াতে পারে। রাজধানীর বেশিরভাগ হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিংহোম এবং ডেন্টাল ক্লিনিক হাসপাতাল-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাইরে থাকায় সেগুলো নগরবাসী, হাসপাতালের কর্মচারী এবং ডাস্টবিন থেকে যারা এগুলো কুড়ায়, সেসব ছিন্নমূল মানুষদেরকেও স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে কারণে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকদের অবশ্যই সচেতন ও দায়িত্ববান হওয়া দরকার।

একজন কলেরারোগীর বর্জ্যের সংস্পর্শে এলে যেকোনো সুস্থ ব্যক্তিরও কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় কোনো রোগ সংক্রমিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এভাবে যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস প্রভৃতি রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। ফেলে রাখা ইনজেকশনের সুচ থেকে টিটেনাস, হেপাটাইটিস– এর মতো মারাত্মক রোগ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে।

মারাত্মক ধরনের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে বর্জ্যগুলোকে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো রোগের জীবাণু কীভাবে মুক্ত করা যায়, সে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

রোগীর স্যালাইন ও ইনজেকশনের সূচ স্টেরিলাইজ না করে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনরক্ষাকারী বিষয়গুলো সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনের মধ্যেই হাসপাতাল-বর্জ্যও ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কখনও সচেতনতার অভাবে, আবার কখনও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থ বাঁচাতে গিয়ে। কিন্তু এই অল্প সাশ্রয় বা অসচেতনতার জন্য ঘটে যাচ্ছে ভয়াবহ বিপদ। কারণ এসব ডাস্টবিন থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ, স্যালাইনের ব্যাগ, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ কুড়াচ্ছে টোকাইরা। তাদের হাত ঘুরে এসব একবার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি চলে যেতে পারে কোনো অসাধু ব্যবসায়ীর হাতে অথবা হাত ঘুরে কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে। এক রোগ সারাতে গিয়ে, কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে নতুন কোনো রোগে। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, হাসপাতালের কর্মী বিশেষ করে নার্স বা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অনেকেই হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, চর্মরোগ/এলার্জি, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, মাথাব্যথা, কাশি বা অ্যাজমার মতো রোগে ভুগছে।

হাসপাতালের বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা না হলে প্রথমত ওই হাসপাতালে যারা কাজ করে তাদের জন্যই বিপজ্জনক। দ্বিতীয়ত, নগরীর যেখানে-সেখানে বা সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হলে তা পুরো নগরবাসীর জন্যই বিপজ্জনক। তৃতীয়ত, যেসব দরিদ্র টোকাই ডাস্টবিন খুঁজে প্লাস্টিক সামগ্রী বা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বের করে তাদের জন্যও বিপজ্জনক। চতুর্থত, এসব পুরনো সিরিঞ্জ বা স্যালাইনের বোতল যদি কোনো রোগীর ওপর ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক। এরকম মারাত্মক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হাসপাতাল-বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই।

তাহলে আমাদের করণীয় কী? মনে রাখতে হবে, হাসপাতালের সকল বর্জ্যই কিন্তু বিপজ্জনক নয়। বরং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ বর্জ্য থেকে রোগ সংক্রমণ হতে পারে। অবশিষ্ট বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের মতোই। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে ওই ক্ষতিকর বর্জ্যগুলোকে পৃথক করা, প্রকারভেদে তার বিভিন্ন অংশকে স্টেরিলাইজ করা, পুড়িয়ে ফেলা, মাটির নিচে পুঁতে ফেলা এবং ইনসিনারেটর-সমৃদ্ধ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া। আর তার জন্য প্রয়োজন হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন করে তোলা। সিটি কর্পোরেশনগুলোকে হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ করে ট্রিটমেন্ট প্লান্টে নিয়ে যাওয়া এবং ট্রিটমেন্ট করার জন্য যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রাইভেট সেক্টর এবং এনজিওগুলোকে হাসপাতাল-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব হবে।

[লেখক: পরিবেশ-লেখক। ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন বিষয়ে মাস্টার্স।]